ব্যবস্থাপনা
Management

১২

কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য অর্জনের নিমিত্তে অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়াই হলো মূলত ব্যবস্থাপনা। আর সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনার থাকে বহুবিধ উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিভেদে ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যও বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন, প্রতিষ্ঠান যদি ব্যবসায়মূলক কোনো সংগঠন হয়, তাহলে ব্যবস্থাপনার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে মুনাফা অর্জন। আবার প্রতিষ্ঠান যদি সামাজিক সেবা প্রদানকারী হয়, তাহলে এর ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হবে জনগণের কল্যাণসাধন। ব্যবস্থাপনার পরশ ব্যতীত জীবন অচল তবে ক্ষেত্র ভেদে এবং পাত্রভেদে ব্যবস্থাপনার ধরন ও কৌশলে ভিন্নতা থাকতে পারে। ব্যবস্থাপনা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। অর্থের ভিন্নতা থাকলেও ব্যবস্থাপনা আবশ্যকতা সবার কাছে সমভাবে অনুভূত হয়। এ কারণে পারিবারিক-সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ওপর প্রতিনিয়তই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ ইউনিটে আমরা ব্যবস্থাপনার প্রকৃতিসহ ব্যবস্থাপনার চারটি কার্যাবলি পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১২.১: ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি
পাঠ - ১২.২: পরিকল্পনা
পাঠ - ১২.৩: সংগঠন
পাঠ - ১২.৪: নেতৃত্ব ও প্রেষণা
পাঠ - ১২.৫: নিয়ন্ত্রণ

দ্রষ্টব্য: এ ইউনিটটি রচনাকালে ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা* শীর্ষক বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

পাঠ ১২.১ ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি
Nature of Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনা কী এবং ব্যবস্থাপক কে বলতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার স্তরগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা চক্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপকের দক্ষতাগুলো লিখতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা একটি সার্বজনীন বিষয়। মানব জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই কোনো না কোনভাবে ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব বিরাজমান মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যেমন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অত্যাবশ্যকীয়, তেমনি ব্যবসায় সংগঠন, রাষ্ট্র পরিচালনায়, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সামরিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও ব্যবস্থাপনা এক অপরিহার্য বিষয়। ব্যবস্থাপনা কোনো ব্যক্তির জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োগযোগ্য তেমনি পারিবারিক ক্ষেত্রে, সামাজিক সংগঠন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে প্রয়োগ করা যায়। নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে ব্যক্তি জীবনকে যেমন সমৃদ্ধশালী করা যায় তেমনি সামাজিক সংগঠন; যেমন- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সমিতি, ধর্মীয় সংগঠন পরিচালনায় ব্যবস্থাপনার রীতিনীতি অনুসরণযোগ্য। আবার উৎপাদন, বণ্টন, পরিবহন, ব্যাংকিং, বিমা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ব্যবসায়িক কার্যে জড়িত সংগঠনেও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না থাকলে সফলতার সাথে ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করা যায় না। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনও সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার অভাবে অচল হয়ে পড়তে পারে। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে এ পাঠে আমরা ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করবো।

ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা
Definition of management

একটি প্রতিষ্ঠান উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যেসব কার্যাবলি সম্পাদন করে সেগুলোকে একত্রে ব্যবস্থাপনা বলে। প্রশ্ন হতে পারে প্রয়োজনীয় সম্পদগুলো কী? প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ, বস্তুগত সম্পদ, আর্থিক সম্পদ ও তথ্য সম্পদ হলো একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সম্পদ। আর এ সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা ও নেতৃত্বদান, সমন্বয় সাধন, প্রেষণা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখা করেছেন। এবার, আসুন সেগুলো সম্পর্কে জেনে নিই।

- আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক **হেনরি ফেয়ল** (Henri Fayol) - এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, সংগঠিত করা, নির্দেশ প্রদান, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ।" [To mange is to forcast and plan, to organize, to command, to coordinate and control.]
- **জর্জ আর. টেরি** (George R. Terry) বলেছেন, "ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি স্বতন্ত্র সামাজিক প্রক্রিয়া যা মানুষ ও সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনের নিমিত্তে পরিকল্পনা, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত।" [Management is a distinct social process consisting of

planning, organizing and conrolling, designed to accomplish the objective by the use of people and resources.] জর্জ টেরি ব্যবস্থাপনাকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

- **আর.ডাব্লিউ. গ্রিফিন** (R.W. Griffin) – এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হলো কতগুলো কার্যাবলির সমষ্টি (সেগুলো হলো পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠিতকরণ, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ) যা একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদসমূহ কাজে লাগানোর জন্য পরিচালিত হয়, আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিপুণতার সাথে ও ফলপ্রসূ উপায়ে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করা।" [Management is a set of activities (including planning and decision making, organizing, leading and controlling) directed at an organization's resources (human, financial, physical and information) with the aim of achieving organizational goals in an efficient and effetive manner.]

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা ও নেতৃত্বদান, প্রেষণা, সমন্বয় সাধন, এবং নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যাবলীর সমষ্টিগত রূপ যা কোনো সংঠনের পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দক্ষতার সাথে অর্জনের নিমিত্তে সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়।
ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবস্থাপনা–

- প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত;
- প্রতিষ্ঠানের সর্ব প্রকার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের সাথে জড়িত;
- পরিকল্পনা তৈরি, সংগঠিতকরণ, কর্মীদেরকে নেতৃত্বদান ও পরিচালনা, কর্মীদের প্রেষণাদান ও তাদের কাজের সমন্বয়সাধন ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত।

ব্যবস্থাপক কে

Who is manager

ব্যবস্থাপক এমন একজন ব্যক্তি যিনি ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি সম্পাদন করার জন্য মূলত দায়ী থাকেন। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায়, তিনিই হলেন একজন ব্যবস্থাপক যিনি কোনো সংগঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কার্যাবলি ও সম্পদ সংগঠিত করেন, নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

বর্তমান যুগের ব্যবস্থাপকগণ চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিনিয়তই। তাদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হয়। তাদের ওপর থাকে প্রচণ্ড চাপ। বিশ্বায়ন (Globalization), দেশের ভেতরে প্রতিযোগিতা, সরকারি নিয়ন্ত্রণবিধি এবং শেয়ারহোল্ডারদের চাপের কারণে ব্যবস্থাপকগণ অহরহই জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করছেন।

একজন ব্যবস্থাপক অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। তিনি তার দলের সদস্যদের বা অধীনস্থ কর্মীদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন। তাই বলা হয়, যিনি অন্যদের কাজ তত্ত্বধান করেন ও তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন, তিনিই ব্যবস্থাপক। লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেন, অধীনস্থদের নির্দেশ-পরামর্শ প্রদান করেন, প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দেন এবং সকল কর্মীর কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন।

ব্যবস্থাপকদের শ্রেণিবিন্যাস বা ব্যবস্থাপনার স্তর

Classification of managers or levels of management

প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থাপক থাকেন। প্রতিষ্ঠানের স্তর অনুযায়ী ব্যবস্থাপকদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। ব্যবস্থাপনার স্তর বলতে প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান নানা ধরনের ব্যবস্থাপক থাকে তাদের পদমর্যাদাগত অবস্থানকে বোঝানো হয়। বড় প্রতিষ্ঠানে সাধারণত তিন ধরনের ব্যবস্থাপনার স্তর বিদ্যমান– উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন। এই স্তরের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়। চিত্র ১২.১ এর সাহায্যে ব্যবস্থাপনা স্তরের প্রদর্শন করা হলো:

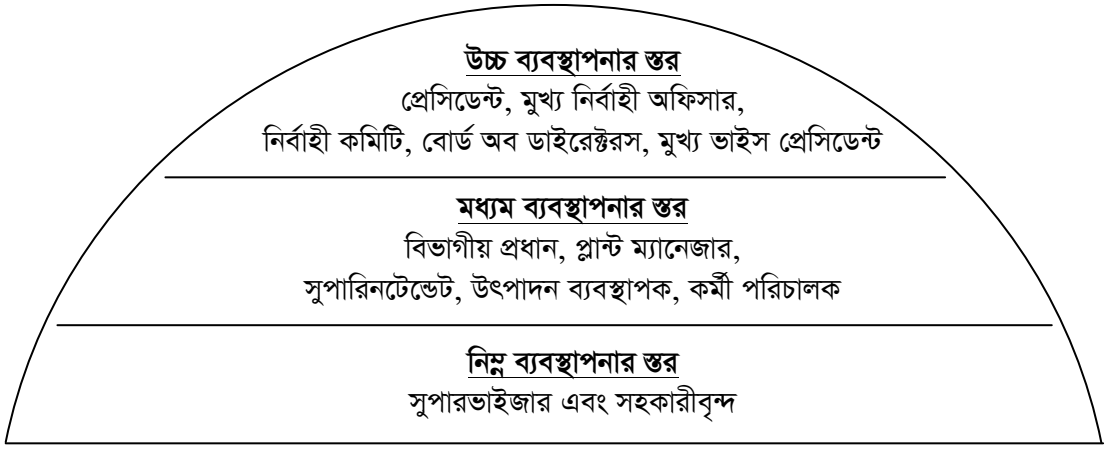

চিত্র ১২.১: ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে যারা অন্তর্ভুক্ত (পদবিসহ)

১. **উচ্চ ব্যবস্থাপনা (Top Management):** উচ্চ ব্যবস্থাপনা স্তরের ব্যবস্থাপকগণ সংগঠনের নীতিমালা প্রণয়ন ও সকল কাজের সমন্বয় সাধন করেন। এ স্তর পুরো সংগঠনের কাজের জন্য দায়ী। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ভেদে ব্যবস্থাপকদের পদবির নাম ভিন্ন হতে পারে। একটি বেসরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ স্তরে সাধারণ প্রেসিডেন্ট, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর চেয়ারম্যান, বোর্ডের নির্বাহী কমিটি, প্রধান নির্বাহী অফিসার এবং মুখ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অন্তর্ভুক্ত থাকেন, এরা সাধারণত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত। এ স্তরের ব্যবস্থাপকগণ প্রতিষ্ঠানের নীতি এবং দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা সম্পকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২. **মধ্যম ব্যবস্থাপনা (Middle Management):** মধ্যম ব্যবস্থাপনা স্তরে সবচেয়ে বেশি ব্যবস্থাপক থাকেন। বিভাগীয় প্রধান, ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, কর্মী পরিচালক, উৎপাদন ম্যানেজার ইত্যাদি। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নীতি প্রণয়ন এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন। এরপর মধ্যম স্তরের ব্যবস্থাপকগণ এ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ও কার্য পদ্ধতি তৈরি করেন। এরপর বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৩. **অপারেটিং ব্যবস্থাপনা (Operating Management):** ব্যবস্থাপনার তৃতীয় স্তর হলো অপারেটিং স্তর। এ স্তর সংগঠনের নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপকদের সাথে সম্পর্কিত। এ স্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ; যথা-সহকারী ব্যবস্থাপক, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, সুপারভাইজার বা ফোরম্যান। এরা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।

ওপরে বর্ণিত তিনটি ব্যবস্থাপনা স্তর মূলত বড় সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ছোট প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের স্তর নেই বললেই চলে। উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের কাজের প্রকৃতি সৃজনশীল। এখানে ব্যবস্থাপকের কাজের প্রকৃতি সৃজনশীল। এখানে ব্যবস্থাপকের মুন্সিয়ানার ওপর এ সৃজনশীলতার মাত্রা নির্ভর করে। অপরদিকে মধ্যম পর্যায়ের কাজের প্রকৃতি একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে যা অনেকটা রুটিন মাফিক। এরপরের স্তরের ব্যবস্থাপকগণের কাজের পরিধি ব্যাপক এবং কার্যাবলির ধরন অনেকটা রুটিনমাফিক অর্থাৎ ছকে বাধা। ব্যবস্থাপনার স্তর যেভাবেই থাকুন না কেন সকলের সম্মিলিত চেষ্টার কারণেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হয়।

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি

Functions of management

সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এর মানবীয় ও অমানবীয় উপকরণের সঠিক ব্যবহার ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপকগণ যেসব কাজ সম্পাদন করেন সেগুলোকেই ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বলে। ব্যবস্থাপনার এসব কার্যাবলি সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রকম মতামত দিয়েছেন। আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকজন লেখকের মতামত দেওয়া হলো:

লেখকের নাম	ব্যবস্থাপনার কাজের নাম
হেনরি ফেয়ল	পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ
অইরিচ ও কুঞ্জ	পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নেতৃত্বদান এবং নিয়ন্ত্রণ
এল. গুরিক	পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন, রিপোর্ট প্রদান এবং বাজেট প্রণয়ন (POSDCORB)
ই. এফ. এল. ব্রিচ	পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, প্রেষণা এবং নিয়ন্ত্রণ
আর. ডাব্লিউ. গ্রিফিন	পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ, সংগঠন, নেতৃত্বদান এবং নিয়ন্ত্রণ

তবে আধুনিক লেখকদের মতে ব্যবস্থাপনার মুখ্য কাজ চারটি: যথা-পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ। এগুলোর ভেতরে প্রাসঙ্গিক কাজ রয়েছে। যেমন- কর্মীসংস্থান, প্রেষণা ও সমন্বয় সাধন ইত্যাদি। এ কার্যসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হয় বিধায় এগুলোকে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াও বলা হয়। নিচে একটি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি চিত্রে দেখানো হলো:

চিত্র ১২.২: ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি

এবার আসুন, এগুলো নিয়ে নিচের বিস্তারিত আলোচনা করি।

১. **পূর্বানুমান (Forecasting):** লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে অতীত ও বর্তমানের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে একটি পূর্বাভাস প্রণয়ন করতে হয়। কার্যকর ও নিপুণ পূর্বানুমানের ওপর পরিকল্পনার সফল প্রয়োগ নির্ভর করে।

২. **পরিকল্পনা (Planning):** ভবিষ্যতে কোন কাজ কোথায়, কখন, কীভাবে, কার দ্বারা সম্পাদন করা হবে তার পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তই পরিকল্পনা। পরিকল্পনার প্রথম কাজ হলো প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্য স্থির করা। এরপর লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে কি করা হবে তা নির্ধারণ করা। পরিকল্পনায় ভুল থাকলে পুরো উদ্যোগটিই ব্যর্থ হতে পারে। বাস্তবে ঐ ব্যবস্থাপকই সফল, যিনি পরিকল্পনা প্রণয়নে মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন।

৩. **সংগঠন (Organizing):** পরিকল্পনার পরই প্রতিষ্ঠানের মানবীয় ও অমানবীয় উপাদানগুলোকে একত্রীকরণ ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সেগুলোকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করে। এটাই মূলত সংগঠিতকরণ।

৪. **কর্মীসংস্থান (Staffing):** সংগঠিতকরণের পরের কাজটি হলো প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ করা। এরপর ব্যবস্থাপনাকে সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শ্রমিক-কর্মীর সংখ্যা নির্ধারণ, উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন, নিয়োগদান, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ও পদচ্যুতি ইত্যাদি করতে হয়।

৫. **নির্দেশনা ও নেতৃত্বদান (Directing and leading):** প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যসম্পাদনের জন্য কর্মীদেরকে নির্দেশ প্রদান করতে হয়। কর্মীরা কোন কাজ কখন করবে, কীভাবে করবে এ সম্পর্কিত আদেশ

প্রদানকেই সাধারণভাবে নির্দেশনা বলে। নেতা হিসেবে ব্যবস্থাপক কর্মীদের নির্দেশনা প্রদান করেন, প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করেন, তত্ত্বাবধান করেন, সর্বোপরি তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করেন। তাই নির্দেশনা হলো ব্যবস্থাপনার সঞ্জীবনী শক্তি।

৬. **প্রেষণা (Motivation):** কর্মীদের মধ্যে আগ্রহ জাগ্রত করার প্রক্রিয়াকে প্রেষণা বলে। কর্মীদের সুবিধা-অসুবিধা, আবেগ-অনুভূতি, সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি সঠিক বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন আর্থিক ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে কর্মীদেরকে কার্যে প্রেষণা দেওয়া হয়। প্রেষণার মাধ্যমে কর্মী পূর্ণ উদ্যামে দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজে আগ্রহী হয়।

৭. **সমন্বয়সাধন (Co-ordination):** সমন্বয়সাধন হলো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের কাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রক্রিয়া। পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতে কাজে ভারসাম্য আসে, শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং উন্নত সেবা নিশ্চিত করে দ্রুত লক্ষ্য অর্জন করা যায় এবং সমন্বয় সাধন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা সংগঠনের সকল বিভাগের কাজের মধ্যে মিলন ঘটায়।

৮. **নিয়ন্ত্রণ (Controlling):** ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ হলো নিয়ন্ত্রণ। পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কিনা কিংবা ব্যবস্থাপকগণের নির্দেশ মোতাবেক কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কি-না তা দেখা এবং কোনোরূপ বিচ্যুতি হলে তার সংশোধন করাকেই নিয়ন্ত্রণ বলে। নিয়ন্ত্রণ মূলত: 'Verification of Performance'.

ওপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পরিকল্পনা, সংগঠন, স্টাফিং, প্রেষণা, সমন্বয় কার্যগুলো প্রতিকারমূলক এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যটি অনেকটা নিরাময়মূলক। পরবর্তী পাঠগুলোতে আমরা ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলি- পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আরো বিশদ আলোচনা করবো।

ব্যবস্থাপনা চক্র

Management cycle

ব্যবস্থাপনার কাজগুলো একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে আবর্তিত হয়। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় রয়েছে পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা ও নেতৃত্বদান, প্রেষণা, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ। এ কার্যগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ কাজ। কিন্তু কোনো রকম সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুনরায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। আবার কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা ও নেতৃত্বদান, প্রেষণা, সমন্বয়সাধন এবং নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য একবার অর্জনের পর পুনরায় নতুন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আবার সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা ও নেতৃত্বদান, প্রেষণা, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণের দরকার হয়। সুতরাং দেখা যায়, ব্যবস্থাপনার কাজগুলো অব্যাহত ও চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এটিই মূলত ব্যবস্থাপনা চক্র। নিচে ব্যবস্থাপনা চক্রটি দেখান হলো:

চিত্র ১২.৩: ব্যবস্থাপনা চক্র

ওপরের চিত্রে প্রদর্শিত ব্যবস্থাপনার প্রতিটি কাজ পর্যায়ক্রম চলতে থাকে। কোনো কাজ শেষ হওয়ার পর নতুন কাজের জন্য আবার পরিকল্পনা করতে হয়। এভাবেই ব্যবস্থাপনার কাজ পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। আর সে কারণেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার মৌলিক কার্যাবলির অবিরাম ও ঘূর্ণায়মান আবর্তনকে ব্যবস্থাপনা চক্র বলে। ব্যবস্থাপনা চক্র সম্পর্কে জানা হলো। এবার আসুন জেনে নেই কী কী দক্ষতা একজন ব্যবস্থাপকের থাকা দরকার যা না থাকলে ব্যবস্থাপনার এ চক্রটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা সম্ভব নয়।

ব্যবস্থাপকের দক্ষতা

Efficiency of managers

একজন ব্যবস্থাপককে সুচারুরূপে তাঁর দায়িত্ব পালন করার জন্য তাকে কতিপয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এগুলো অর্জন করলে তাকে একজন আদর্শ ব্যবস্থাপক বলা হবে। প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং লক্ষার্জনের জন্য ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা অতি জরুরি। তাহলে আসুন ব্যবস্থাপকের দক্ষতাগুলো জেনে নেই।

১. কারিগরি দক্ষতা

বিশেষ কোনো কাজের ওপর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করাকে কারিগরি জ্ঞান বলে। ব্যবস্থাপককে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় কারিগরি জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। শুধু তাই নয় তাকে সমসাময়িক কারিগরি জ্ঞান সম্পর্কে update থাকতে হবে।

২. মানবীয় সম্পর্কে দক্ষতা

একজন ব্যবস্থাপককে মানুষ তথা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিয়ে কাজ করতে হয়। এছাড়া টিমের অন্যান্য সদস্যদের কাজ করার জন্য তাকে আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। Weihrich and Koontz -এর মতে, মানবীয় দক্ষতা হলো কর্মীদের সাথে কাজ করার সামর্থ্য। এ ধরনের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ব্যবস্থাপক খুব সহজেই কর্মীর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে।

৩. ধারণাগত দক্ষতা

একজন ব্যবস্থাপককে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের নানা বিষয় সঠিকভাবে বোঝার দক্ষতা থাকতে হবে। আর এটিকেই ধারণাগত দক্ষতা বলা হয়। ধারণাগত দক্ষতা বলতে প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিকতার সাথে সঠিকভাবে দেখার ক্ষমতাকে বোঝায়। সোজা কথা ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানকে own করবে। Terry and Tranklin-এ বিষয় বলতে গিয়ে বলেছেন যে, বিশেষ অবস্থায় সংগঠনকে বোঝা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে অবস্থার উত্তরণ ঘটানোর সামর্থ্যই হলো ধারণাগত দক্ষতা।

৪. বিশ্লেষণমূলক দক্ষতা

ইংরেজিতে একটি কথা আছে তা হলো 'Managing in a dynamic environment'- এ দ্বারা বোঝায় কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপককে বিচারবিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সুতরাং ব্যবস্থাপককে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা থাকতে হবে।

৫. যোগাযোগ দক্ষতা

ব্যবস্থাপককে প্রতিষ্ঠানের ভেতরের এবং বাহিরের পক্ষসমূহের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করতে হয়। এ ছাড়া প্রতিনিয়ত তাকে নিজস্ব জ্ঞান, ধারণা ও মতামত অধঃস্তনের মাঝে জানাতে হয়। সুতরাং তাকে অবশ্যই পর্যাপ্ত যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।

ওপরের আলোচনায় দেখা যায় ব্যবস্থাপকের কার্যকারিতা নির্ভর করছে তিনি কতটুকু দক্ষ। এ ক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতা তাকে একজন সফল ব্যবস্থাপক হতে সহায়তা করে।

সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা ও নেতৃত্বদান, প্রেষণা, সমন্বয় সাধন, এবং নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যাবলির সমষ্টিগত রূপ, যা কোনো সংঠনের পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দক্ষতার সাথে অর্জনের নিমিত্তে সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। আর ব্যবস্থাপক হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যিনি ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি সম্পাদন করার জন্য মূলত দায়ী থাকেন। প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থাপক থাকেন। প্রতিষ্ঠানের স্তর অনুযায়ী ব্যবস্থাপকদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। ব্যবস্থাপনার স্তর বলতে প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান নানা ধরনের ব্যবস্থাপক থাকে তাদের পদমর্যাদাগত অবস্থানকে বোঝানো হয়। বড় প্রতিষ্ঠানে সাধারণত তিন ধরনের ব্যবস্থাপনার স্তর বিদ্যমান– উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন। এই স্তরের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়। এ ব্যবস্থাপকগণ বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এর মানবীয় ও অমানবীয় উপকরণের সঠিক ব্যবহার ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপকগণ যেসব কাজ সম্পাদন করেন সেগুলোকেই ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বলে। আধুনিক লেখকদের মতে ব্যবস্থাপনার মুখ্য কাজ চারটি: যথা-পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ। এগুলোর ভেতরে প্রাসঙ্গিক কাজ রয়েছে। যেমন- কর্মীসংস্থান, প্রেষণা ও সমন্বয় সাধন ইত্যাদি। একজন ব্যবস্থাপককে সুচারুরূপে তাঁর দায়িত্ব পালন করার জন্য তাকে কতিপয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এগুলো অর্জন করলে তাকে একজন আদর্শ ব্যবস্থাপক বলা হবে। প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং লক্ষার্জনের জন্য ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা অতি জরুরি।

পাঠ ১২.২ পরিকল্পনা প্রণয়ন
Planning

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিকল্পনা কী জানতে পারবেন।
- পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিকল্পনার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মৌলিক কার্যাবলির মধ্যে পরিকল্পনা হচ্ছে প্রথম ও মুখ্য কাজ। এটি এক বিশেষ ধরনের সিদ্ধান্ত বা সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত। L.A. Allen এর ভাষায় অর্থাৎ "পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যতকে বন্দী করার একটি ফাঁদ"। শুধু ব্যবসায় জগতেই নয়, পরিকল্পনা বিষয়টি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ব্যবসায় জগতে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা হচ্ছে লক্ষ্যভিত্তিক অগ্রযাত্রার পথিকৃত। এ পাঠে পরিকল্পনা কী তা জানার পাশাপাশি পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ এবং পরিকল্পনার প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো।

পরিকল্পনা কী
What is planning

পরিকল্পনা* হচ্ছে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন কাজ কখন, কিভাবে, কার দ্বারা সম্পাদন করা হবে এসব বিষয়ের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিকে পরিকল্পনা বলে।

পরিকল্পনা ব্যবস্থাপন প্রক্রিয়ার প্রথম ও প্রধান কাজ। এটি ভবিষ্যৎ কার্যের একটি নক্সা বা প্রতিচ্ছবি। পূর্ব অভিজ্ঞতা, পরিসংখ্যানিক তথ্যাদি এবং যুক্তিসঙ্গত কারণের ওপর ভিত্তি করেই পরিকল্পনা রচিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ইতোপূর্বে কী ঘটেছে, কার দ্বারা ঘটেছে, কিরূপে ঘটেছে, কখন ঘটেছে এবং কতটুকু সুফল অর্জিত হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনের জন্য বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থা থেকে উত্তম কর্মপন্থা বাছাই করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটি চিত্রাকারে এভাবে দেখানো যায়–

চিত্র ১২.৪: পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

নিম্নে পরিকল্পনা সম্পর্কে কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যবস্থাপনা বিশারদের সংজ্ঞা দেওয়া হলো:

- **এইচ. আইরিচ** ও **এইচ. কুঞ্জ** (H. Weihrich and H. Koontz)-এর মতে, "নির্বাচিত ব্রত বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের বিকল্প কর্মপন্থা হতে উত্তম কর্মপন্থা নির্বাচন করাকে পরিকল্পনা বলে" [Planning involves selecting missions and objectives and the actions to achieve them; it

* প্রকৃতপক্ষে 'planning'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'পরিকল্পন' হওয়াই সংগত। আর 'পরিকল্পনা'কে plan এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করাই সমীচীন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সে কারণে অত্র গ্রন্থে planning এবং plan এ দুটোর শব্দ প্রতিশব্দ হিসেবে 'পরিকল্পনা' ব্যবহৃত হয়েছে।

requires decision making, that is, choosing future, courses of action from among alternatives]

- **ডাব্লিউ. এইচ. নিউম্যান** (W. H. Newman)-এর মতে, "কী করা হবে তার অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে পরিকল্পনা বলে।" [Planning is deciding in advance what is to be done]
- **আর. এন. ফার্মার** ও **ব্যারি এম. রিচম্যান** (R. N. Farmer & Barry M. Richman)-এর মতানুসারে, "সংগঠিত কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে পরিকল্পনা বলে।" [The Planning is the process of making decision any phase of organisational activity]

সুতরাং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কোন কাজ কখন, কার দ্বারা, কীভাবে সম্পাদিত হবে এ সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যসূচি প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে পরিকল্পনা বলে।

পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ

Steps of planning

পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যত-মুখী অর্থাৎ অতীতের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে কী করা হবে তা নির্ধারণ করা হয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায়। পরিকল্পনায় অনেকগুলো স্তর বা ধাপ রয়েছে। এগুলোকে পরিকল্পনার পদক্ষেপও বলা যায়। পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় এ পদক্ষেপগুলোকে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়। পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

চিত্র ১২.৫: পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ

১. **সুযোগ বা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া (Awareness of opportunities/problems):** হ্যারল্ড কুঞ্জ প্রমুখের মতে, মুখ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ হলো কোনো সুযোগ বা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। যে সমস্যা বা বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করা হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টি করার পর তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা দরকার।

২. **প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ (Collection of relevant information):** পরিকল্পনার সাথে জড়িত কার্যাবলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্যের প্রধান উৎসগুলো হলো অভিজ্ঞতা, অতীতে সমাধানকৃত সমস্যা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ, রেকর্ডপত্র, গবেষণা, প্রতিবেদন ইত্যাদি।

৩. **তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis of information):** সংগৃহীত তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে কোন কোন তথ্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় এবং কোনগুলো পরিকল্পনার সাথে জড়িত। বিশ্লেষণের জন্য তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস ও সারণিকরণ প্রয়োজন।

৪. **প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ (Setting goals of the organisation):** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটি মূল লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্য কি হবে তা নির্ধারণ করা ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালিত হয়। এ কারণে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা দরকার।

৫. **পরিকল্পনার অজ্ঞান বা পটভূমি প্রতিষ্ঠা (Establishing planning premises):** পরিকল্পনার এ পর্যায়ে পরিকল্পনার অঙ্গন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভবিষ্যতে যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা রচিত হবে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা ঠিক করাকে পরিকল্পনার অঙ্গন প্রতিষ্ঠা বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, পরিকল্পনা প্রক্রিয়া চালু থাকা অবস্থায় পরিকল্পনার প্রত্যাশিত পরিবেশই হলো পরিকল্পনা অঙ্গন।

৬. **বিকল্প কর্মপন্থ নির্ধারণ (Determining alternative courses of action):** একটি পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নকারীর অন্যতম দায়িত্ব হলো পরিকল্পনার অঙ্গন প্রতিষ্ঠার পর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সম্ভাব্য বিকল্প কর্মপন্থা নিরূপণ করে সেগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা তা পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা।

৭. **বিকল্প কর্মপন্থাসমূহ পর্যালোচনা (Analysis of alternative courses of action):** বিকল্প কর্মপন্থাসমূহ নির্ধারণ করে এগুলোর ভালো ও মন্দ দিকগুলো পরীক্ষানিরীক্ষার পর প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্যের আলোকে কর্মপন্থাসমূহকে পর্যালোচনা করে দেখা হয়। অর্থাৎ একটি বিকল্প আরেকটির তুলনায় শ্রেয়, না-কি নিকৃষ্ট এবং কেন শ্রেয় বা নিকৃষ্ট তা বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা হয়।

৮. **উপযুক্ত কর্মপন্থা বাছাইকরণ (Selection of proper course of action):** বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থা পর্যালোচনার পর কোনটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তা বাছাই করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপককে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয় এবং বৈজ্ঞানিক কৌশলাদির প্রয়োগ ছাড়াও নিজের মেধা ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করতে হয়। কারণ, সত্যিকার অর্থে এ পর্যায়েই চূড়ান্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

৯. **গৌণ পরিকল্পনা প্রণয়ন (Preparing derivative plans):** এক বা একাধিক উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হলে মূল পরিকল্পনা সম্পর্কিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বটে, কিন্তু পরিকল্পনা প্রণয়নের সবকাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় না। এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপককে মূল লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে মূল পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে কতিপয় গৌণ বা সহকারী পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। মূল পরিকল্পনাকে সাপোর্ট করার জন্য গৌণ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

১০. **পরিকল্পনাকে বাজেটে রূপান্তর (Budgeting):** কোনো কোনো গ্রন্থাকারের মতে, গৌণ পরিকল্পনা তৈরির সাথে সাথেই পরিকল্পনার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না। তাদের মতে, গৌণ পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে এ ধাপে এসে গৃহীত পরিকল্পনাগুলোকে সংখ্যাত্মকরূপে বাজেটে পরিণত করা প্রয়োজন। তা হলেই পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গরূপ পায়। পরিকল্পনাকে সংখ্যায় প্রকাশ করা হলে তাকে বাজেট বলা হয়।

১১. **অনুবর্তন (Follow up):** পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পদক্ষেপ হল অনুবর্তন। পরিকল্পনা প্রণয়নকালে ইতোপূর্বে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, শেষ পর্যায়ে এ বিষয়টি দেখা হয়। অনুবর্তনকালে কোনো প্রকার সমস্যা দেখা দিয়ে পরিকল্পনা প্রণেতারা তা সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেন।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় গৃহীত প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন প্রকার তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বানুমান করেন এবং ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য সম্ভাব্য ঘটনাবলি বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করেন। এ কারণে আহরিত তথ্যের গুণমানের ওপর পরিকল্পনা গুণমান বহুলাংশে নির্ভরশীল।

পরিকল্পনার প্রকারভেদ

Types of plans

যে কোনো প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনার এ প্রকারভেদ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থাকার ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এগুলোকে তিনটি ভিত্তিতে বিভক্ত করে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

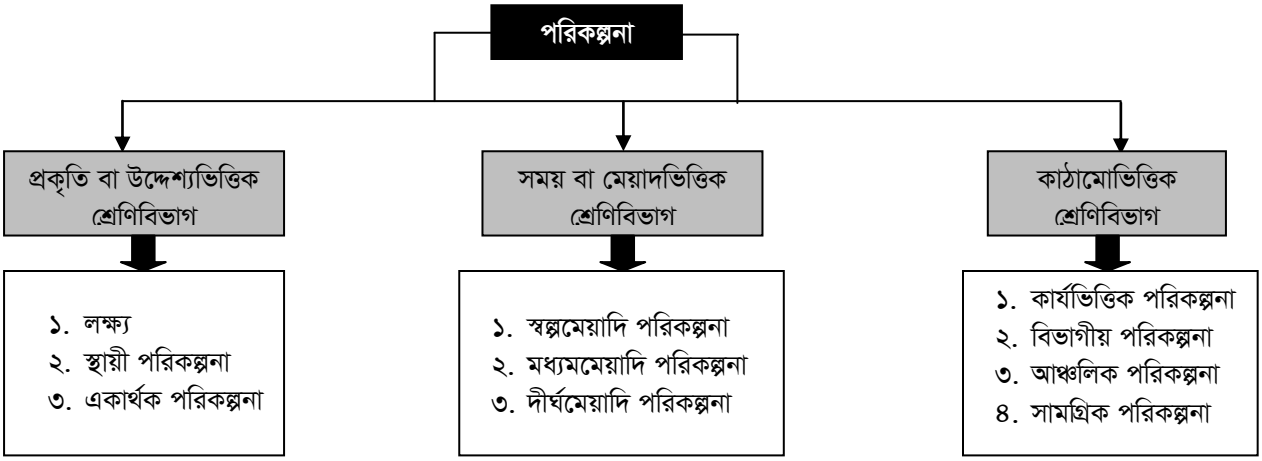

চিত্র ১২.৬: বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা

প্রকৃতি বা উদ্দেশ্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Classification on the basis of nature or objective)

১. **লক্ষ্য *(Goal)*:** কোনো প্রত্যাশিত ও সুনির্দিষ্ট ফল অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে লক্ষ্য বলে। উদাহরণস্বরূপ– ২০০২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যয় ১০% কমাতে হবে– এটি একটি লক্ষ্য। লক্ষ্য একটি সুনির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দেশ করে এবং এতে পৌঁছাবার জন্য সংগঠিতকরণ, কর্মীসংগ্রহ, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পাদন করা হয়। লক্ষ্য– এর পাঁচটি উপাদান থাকে– সুনির্দিষ্ট, পরিমাপনযোগ্য, যথোপযুক্ত, বাস্তবসম্মত, নির্দিষ্ট সময়, এগুলো সংক্ষেপে SMART হিসেবে পরিচিত। উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, সীমারেখা, কোটা, আদর্শমান, মিশন ইত্যাদি লক্ষ্যের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

২. **স্থায়ী পরিকল্পনা *(Standing plan)*:** একই ধরনের সমস্যা বার বার উদ্ভূত হলে সেসব মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে। অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠানে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণীত যে পরিকল্পনা একই ধরনের ক্ষেত্রে বার বার ব্যবহার করা হয় তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলা হয়। নীতি, পদ্ধতি, রীতি বা পন্থা ইত্যাদি স্থায়ী পরিকল্পনার আওতাভুক্ত। একটি সমস্যা সমাধান হয়ে গেলেই এ পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয় না।

৩. **একার্থক পরিকল্পনা *(Single use plan)*:** বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে একার্থক পরিকল্পনা বলে। উদ্দেশ্য সাধিত হলে এ পরিকল্পনারও সমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোন সমস্যা সমাধানকল্পে অথবা বিশেষ কোনো ঘটনা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে যখন বিশেষ ধরনের মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাই একার্থক পরিকল্পনা। এ ধরনের পরিকল্পনা বার বার ব্যবহার করা হয় না।

সময় বা মেয়াদভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Classification on the basis of time or period)

১. **স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা *(Short term plan)*:** স্বল্পকাল স্থায়ী পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। এ পরিকল্পনা সাধারণত ১ বছর মেয়াদি হয়। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দুই প্রকারের হয়; যথা- এ্যাকশন প্লান, রি-এ্যাকশন প্লান।

২. **মধ্যম মেয়াদি পরিকল্পনা *(Intermediate term plan)*:** মধ্যম মেয়াদের পরিকল্পনা সাধারণত ১ বছর থেকে ৫ বছর মেয়াদের জন্য করা হয়ে থাকে। মধ্যম ও প্রথম স্তরের ব্যবস্থাপকদের জন্য এরূপ পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা *(Long term plan)*:** দীর্ঘমেয়াদের জন্য এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। সাধারণত ৫ বছরের বেশি সময়ের জন্য কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে তা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। অবশ্য কোনো কোনো বৃহৎ কোম্পানি ১৫/২০ বছরের জন্যও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মোটরস কর্পোরেশন এদের মধ্যে একটি।

কাঠামোভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Structural classification)

১. **কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা *(Functional plan)*:** যে পরিকল্পনা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কার্যের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয় তাকে কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা বলে। যেমন– প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এসব পরিকল্পনা তৈরির প্রক্রিয়া হচ্ছে কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া।

২. **বিভাগীয় পরিকল্পনা *(Departmental plan)*:** প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক পরিকল্পনা তৈরি করা হলে সেগুলোকে বিভাগীয় পরিকল্পনা হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণীত হলে সেক্ষেত্রে কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা ও বিভাগীয় পরিকল্পনা একই হয়।

৩. **আঞ্চলিক পরিকল্পনা *(Regional or geographical plan)*:** সাধারণত বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এ ধরনের পরিকল্পনা তৈরি করে থাকে। আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক পরিকল্পনা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অঞ্চল বা শাখার জন্য প্রণীত পরিকল্পনা।

৪. **সামগ্রিক পরিকল্পনা *(Master plan)*:** প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ বা অঞ্চলের পরিকল্পনাকে একত্রিত করে কেন্দ্রীয়ভাবে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে সামগ্রিক পরিকল্পনা বা মাস্টার প্লান বলে। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের মাস্টার প্লান সামগ্রিক পরিকল্পনা নামে পরিচিত।

সারসংক্ষেপ

পণ্য হলো সে সব দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বস্তু যা মানুষ ভোগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদা ও অভাব পূরণ করতে পারে এবং যা অর্থের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য। সাধারণভাবে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিভুক্ত করা হয়। বাজারজাতকরণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে পণ্যদ্রব্য প্রধানত দু প্রকার: (ক) শিল্পপণ্য- যে সকল পণ্য সরাসরি ভোগ বা ব্যবহার করা হয়না বরং পুনরায় প্রক্রিয়াজাতকরণ করার জন্য বা অন্য কোনো পণ্য তৈরি করার কাজে ব্যবহার করা হয়। (খ) ভোগ্যপণ্য- কোনো রকম প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়াই যে সব পণ্য সরাসরি ভোগ বা ব্যবহার করা যায় সেগুলোকে ভোগ্যপণ্য বলে।। এ দু ধরনের পণ্যকে আবার বিভিন্নভাবে বিভাজন করা হয়। ক্রেতাদেও রুচি ও পছন্দের পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে নতুন পণ্যের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রয়োজন হয়। এ কারণে নতুন পণ্য উন্নয়নে উৎপাদনকারীকে ছয়টি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। কোনো পণ্যই চিরকাল একইভাবে বাজার দখল করে রাখতে পারে না। বিভিন্ন কারণে পণ্যের জীবনে উত্থানপতন ঘটে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক পণ্যেরই একটি জীবনচক্র রয়েছে। এ জীবন চক্রের পাঁচটি পর্যায় রয়েছে।

পাঠ ১২.৩ সংগঠন
Organization

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- সংগঠন কী বলতে পারবেন।
- সংগঠনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সংগঠন কাঠামো ও চার্ট কী বলতে পারবেন।
- সংগঠনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

সংগঠন শব্দটি বিভিন্ন অর্থ বহন করে থাকে। কখনো কখনো কোনো প্রতিষ্ঠানকে বোঝাতে সংগঠন শব্দটি ব্যবহার করা হয়; যেমন– ব্যবসায় সংগঠন, সরকারি সংগঠন, সেবামূলক সংগঠন ইত্যাদি। আবার কোনো কিছু গঠন করা অর্থেও সংগঠন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন– ক্লাব, সমিতি কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করা। কিন্তু ব্যবস্থাপনায় সংগঠন শব্দটি ভিন্ন অর্থ বহন করে। এ ক্ষেত্রে সংগঠন বলতে প্রতিষ্ঠানের উপকরণাদি একত্রীকরণ, এতে নিয়োজিত কর্মীদের কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ, তাদের প্রয়োজনীয় দায়দায়িত্ব বণ্টন ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কার্যাবলির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের কাজসমূহ চিহ্নিত করা, এগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা, কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণ করা এবং তাদের কার্যাবলির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনই হচ্ছে সংগঠন। বস্তুত প্রতিষ্ঠানে যেসব ব্যক্তিবর্গ নিয়োজিত থাকে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করে প্রস্তুতকৃত একটি সুবিন্যস্ত কাঠামোই সংগঠন। এটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার সম্পর্কের একটি নেটওয়ার্ক বা জালবিশেষ। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কে কোথায় অবস্থান করবে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হবে এগুলো সংগঠন কাঠামো দ্বারাই স্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যায়। এ পাঠে আমরা সংগঠন এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোকপাত করবো।

সংগঠনের সংজ্ঞা
Definition of organization

কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের উপকরণাদি সংগ্রহ, এর কাজগুলোকে চিহ্নিত ও বিভক্ত করা, এতে কার কী দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব থাকবে তা নির্ধারণ করে সঠিক ব্যক্তির নিকট তা অর্পণ করা এবং নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখা নির্ধারণ করাকে সংগঠন বলে।

একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদের প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ সম্পদসমূহকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল উপায়ে সজ্জিতকরণের প্রক্রিয়াই সংগঠন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের উপকরণসমূহ একত্রীকরণ, কার্যাবলি সনাক্ত ও শ্রেণিবদ্ধ করা, কর্মীদের মধ্যে কে কোন কাজ সম্পাদন করবে, কে কাকে তত্ত্বাবধান করবে তা স্থির করা এবং তাদের একের সাথে অপরের সম্পর্ক কিরূপ হবে তা নির্ধারণ করা ইত্যাদি কার্যাবলির সমন্বিত প্রক্রিয়াই হলো সংগঠন।

সংগঠন সম্পর্কে কয়েকজন প্রখ্যাত লেখকের সংজ্ঞা এখানে তুলে ধরা হলো:

- **অইরিস ও কুঞ্জ** (H. Weihrich and H. Koontz)-এর মতে, "সংগঠনের অর্থ হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কার্যাবলিকে বিভাগীয়করণ, প্রত্যেক বিভাগকে একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে ন্যস্ত করা, তাকে বিভাগীয় কাজ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রদান এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সমান্তরাল ও খাড়াখাড়িভাবে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা।" [Organising is the grouping of activities necessary to attain objectives, the assignment of each groupig to a manager with authority necessary to supervise it, and the provision for coordination horizontally and vertically in the enterprise structure]

- **লুইস এ. এ্যালেন** (Louis A. Allen)-এর মতে সংগঠন হল, "প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সনাক্তকরণ ও শ্রেণিবদ্ধকরণ, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সংজ্ঞায়িতকরণ এবং কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের সাথে সম্পৃক্ত এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে লোকজন সর্বাধিক দক্ষতা ব্যবহার করে উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়।" [The process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives.]
- **হ্যানি** (Haney)-এর বক্তব্য অনুসারে, "কতিপয় সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উৎপাদনের বিশেষায়িত উপকরণসমূহের সুষ্ঠু সমন্বয় হলো সংগঠন।" [Organisation is harmonious adjustment of specialised parts for the accomplishment of some common purpose or purposes]

উপরিউক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করে বলা যায়, একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ সম্পর্ক সৃষ্টি, তাদের কার্যাবলি সনাক্ত করে এগুলোর শ্রেণিবদ্ধকরণ, প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন, তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের সমন্বয় সাধনকে সংগঠন বলে।

সংগঠনের প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ

Process/Steps in organization

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করার কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হয়। ধাপে ধাপে গৃহীত পদক্ষেপগুলো সমষ্টিগতভাবে সংগঠন প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। সংগঠন প্রক্রিয়ার সাথে প্রধানত পাঁচটি পদক্ষেপ জড়িত। এ পদক্ষেপগুলো হচ্ছে-

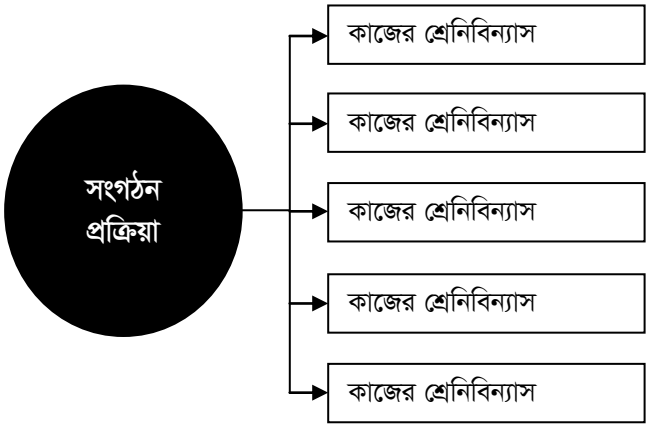

চিত্র ১২.৭: সংগঠনের প্রক্রিয়া

১. **কাজের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of work):** প্রথমেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে যেসব কাজ সম্পন্ন করতে হবে, সেগুলোকে সনাক্ত করা হয় এবং সাধারণত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

২. **কার্যাবলির বিভাগীয়করণ (Departmentation of works):** শ্রেণিবিন্যাসের পর কাজগুলোকে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এটি বিভাগীয়করণ নামে পরিচিত।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক স্তর নির্দিষ্টকরণ (Specifying organisational level):** বিভিন্ন কার্যাবলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাসকৃত কাজগুলোকে স্বতন্ত্র বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করার পর সাংগঠনিক চার্ট তৈরি করা হয়। এ চার্টে কোন ব্যক্তি কার নিকট রিপোর্ট বা জবাবদিহি করবে তা সুনির্দিষ্ট করে দেখান হয়। বিভাগগুলোকে পরস্পরের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের ফলে কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক স্তর সৃষ্টি হয়।

৪. **কর্তৃত্ব অর্পণ (Delegation of authority):** প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন বিভাগে ব্যবস্থাপকসহ সরলরৈখিক বা লাইন ব্যবস্থাপকদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

৫. **সমন্বয়সাধন (Coordination):** বিভাগীয় কাজগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং পরীক্ষণ বা মনিটরিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়। এ প্রক্রিয়া সমন্বয় সাধন নামে পরিচিত।

সংগঠন কাঠামো

Organisation structure

সংগঠন কাঠামোকে উদ্দেশ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ- এ নিয়োজিত কর্মীবৃন্দের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখাকে বলে সংগঠন কাঠামো। এটি প্রতিষ্ঠানের পদবিন্যাস, কার্য-প্রক্রিয়া, কর্মীর দায়িত্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি স্পষ্ট করে তোলে। এ কাঠামো সংগঠনের রূপরেখার দিক নির্দেশক। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের অবস্থানিক চিত্রকে সংগঠন কাঠামো বলে।

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে কীরূপে বিভক্ত করা হবে, কীরূপে এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে তা সংগঠন কাঠামোর মাধ্যমেই প্রকাশ করা হয়। এবার আসুন এ বিষয় অন্যান্য লেখকদের বক্তব্য জেনে নিই–

- **রবিন্স** (Robins) এর মতে, "একটি সংগঠনের কার্যাবলিকে কীরূপে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত করা হয়, শ্রেণিবদ্ধ করা হয় এবং সমন্বয়সাধন করা হয়, সংগঠন কাঠামো তা-ই সংজ্ঞায়িত করে।" [An organization structure defines how job tasks are formally divided, grouped and co-ordinated.]
- **এন.সি.রায় চৌধুরির** মতে, "সংগঠন কাঠামো হলো ব্যবস্থাপনার চিত্র বা নকশা।" [Structure of an organization is the framework of management.]
- **Richman and et al.** এর মতে, "কর্তৃত্বের একটি নির্ধারিত প্রবাহ এবং যোগাযোগই হলো সংগঠন কাঠামো।" [Organization structure has an identifiable flow of authority and communication.]

এবার আসুন ওপরের আলোচনা বিশ্লেষণ করে নিজেরা একটি সংজ্ঞা দেই- কোনো সংগঠনের কার্য-প্রক্রিয়া, কর্মীর পদমর্যাদা, দায়দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনার আঙ্গিক গঠন ইত্যাদির রূপরেখাকেই সংগঠন কাঠামো বলা হয়।

সংগঠন চার্ট

Organisation chart

যখন প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের অবস্থান, তাদের দায়দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের রূপরেখা, পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি ইত্যাদি চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে সংগঠন চার্ট বলে। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মী কোথায় অবস্থান করবে, কে কী দায়িত্ব পালন করবে, কাজের জন্য কে কার কাছে জবাবদিহি করবে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে ইত্যাদি রৈখিক মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে তাকে সংগঠন চিত্র বলা হবে।

চিত্র ১২.৮ লক্ষ্য করুন। চিত্রে একটি প্রতিষ্ঠানে কিভাবে নির্বাহীগণ বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত থাকে তা দেখানো হয়েছে। সংগঠন কাঠামো নিয়ে নানা লেখক নানা ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। এর মধ্যে জেমস্ স্টোনার ও আর. ই. ফ্রিম্যান (James Stoner and R.E. Freeman) এর নাম উল্লেখযোগ্য তাঁর মতে সংগঠন চার্ট হচ্ছে, "সংগঠন কাঠামোর চিত্রটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি, বিভাগ ও পদসমূহ এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রদর্শন করে।" [A diagram of an organization's structure, showing the functions, departments, or positions of the organization and how they are related.]

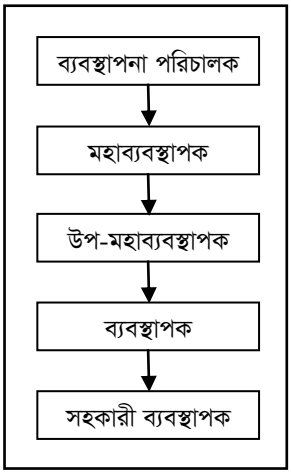

চিত্র ১২.৮: সরল সংগঠন চার্ট

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, সংগঠনে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের অবস্থান, তাদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব এবং পারস্পরিক সম্পর্কের সচিত্র উপস্থাপনকেই সংগঠন চার্ট বলে।

সংগঠনের প্রকারভেদ

Types of Organisation

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি, আকার-আয়তন, কাজের ধরন ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকারের সংগঠনের উদ্ভব হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চার প্রকারের সংগঠন লক্ষ্য করা যায়:

১. সরলরৈখিক সংগঠন ২. সরল রৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন
৩. কার্যভিত্তিক সংগঠন ৪. কমিটি সংগঠন

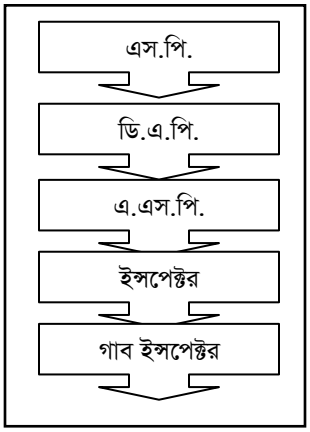

১. **সরল রৈখিক সংগঠন (Line organisation):** যে সংগঠন ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তর থেকে সরাসরি নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে সরলরৈখিক সংগঠন বলে। এ ধরনের সংগঠনের অধীনস্তদের ওপর উর্ধ্বতন নির্বাহীর সরাসরি কর্তৃত্ব থাকে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মীই জানে কার নিকট থেকে তিনি নির্দেশ পাবেন এবং কার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। যে সব ব্যবস্থাপকের সরলরৈখিক কর্তৃত্ব থাকে তাদেরকে সরলরৈখিক কর্মকর্তা বা লাইন ম্যানেজার বলা হয়। পুলিশ কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি সরলরৈখিক সংগঠন চার্ট পার্শ্বের চিত্রে দেখান হলো।

২. **সরল রৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন (Line and staff organisation):** যে সংগঠনে সরলরৈখিক কর্মকর্তার কার্যে সহযোগিতাদানের লক্ষ্যে সরলরৈখিক কর্মকর্তার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ কর্মী বা উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয় তাকে সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন বলে। সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠনে দুধরনের কর্মকর্তা থাকেন। এক ধরনের কর্মকর্তা হচ্ছেন সরলরৈখিক কর্মকর্তা এবং অন্য ধরনের কর্মকর্তা হচ্ছেন উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ কর্মী। উপদেষ্টাগণ সরলরৈখিক কর্মকর্তাকে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের আদেশ-নির্দেশ দানের কিংবা সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষমতা থাকে না। এ সংগঠনকে 'সরলরৈখিক ও পদস্থ সংগঠন' বা 'সরলরৈখিক ও স্টাফ সংগঠন' বলে।

৩. **কার্যভিত্তিক সংগঠন (Functional organisation):** এ ধরনের সংগঠনে ব্যবস্থাপনার কার্যসমূহকে কাজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে প্রতিটি কাজের দায়িত্ব এক একজন নির্বাহীর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের সরলরৈখিক কর্মকর্তা বা লাইন ম্যানেজারের কার্যাবলি তাদেরকে সম্পাদন করতে না দিয়ে আলাদা বিভাগ খোলা হয় এবং সে বিভাগের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা বা ম্যানেজারের নিকট ঐ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাধারণত এমন ধরনের কাজগুলো আলাদা করা হয় যেগুলো লাইন ম্যানেজারের পক্ষে বিশেষায়িত জ্ঞানের অভাবে কিংবা অদক্ষতার কারণে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে যায়।

৪. **কমিটি সংগঠন (Committee organisation):** এটি এমন ধরনের সংগঠন যেখানে বিশেষ কোন প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করার জন্য সাধারণত এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল গঠন করা হয়। এটি বস্তুতপক্ষে একাধিক ব্যক্তির একটি গ্রুপ। কোনো বিশেষ ধরনের প্রশাসনিক কাজ বা অন্য কোনো বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য কয়েকজন ব্যক্তির একটি দল গঠন করা হয়। কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত সুপারিশসহ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা কমিটি এ জাতীয় সংগঠনের উদাহরণ।

উল্লিখিত সংগঠনসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পণ্য বা বাজারভিত্তিক সংগঠন, মেট্রিক্স সংগঠন ইত্যাদির উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়।

সারসংক্ষেপ

একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ সম্পর্ক সৃষ্টি, তাদের কার্যাবলি সনাক্ত করে এগুলোর শ্রেণিবদ্ধকরণ, প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন, তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের সমন্বয় সাধনকে সংগঠন বলে। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করার কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হয়। ধাপে ধাপে গৃহীত পদক্ষেপগুলো সমষ্টিগতভাবে সংগঠন প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। সংগঠন প্রক্রিয়ার সাথে প্রধানত পাঁচটি পদক্ষেপ জড়িত। সংগঠন কাঠামোকে উদ্দেশ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ- এ নিয়োজিত কর্মীবৃন্দের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখাকে বলে সংগঠন কাঠামো। অন্যদিকে, যখন প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের অবস্থান, তাদের দায়-দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের রূপরেখা, পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি ইত্যাদি চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে সংগঠন চার্ট বলে। প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি, আকার-আয়তন, কাজের ধরন ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকারের সংগঠনের উদ্ভব হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চার প্রকারের সংগঠন লক্ষ্য করা যায়: সরলরৈখিক সংগঠন, সরল রৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন, কার্যভিত্তিক সংগঠন এবং কমিটি সংগঠন।

পাঠ ১২.৪ নেতৃত্ব ও প্রেষণা
Leadership and Motivation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- নেতৃত্ব কী বলতে পারবেন।
- নেতৃত্বের ধরনগুলো লিখতে পারবেন।
- আদর্শ নেতার গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রেষণা ও এর মতবাদগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কর্মীদের প্রেষণা দানের উপায়গুলো বলতে পারবেন।

একটি প্রতিষ্ঠানে সকল উপকরণকে সুসংগঠিত করা হলো, কর্মী নিয়োগ দেওয়া হলো, যন্ত্রপাতির সমাবেশ ঘটানো হলো, অর্থ সংগ্রহ করা হল। এতে কি উৎপাদন প্রক্রিয়া অগ্রসর হবে? নিশ্চয় নয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অগ্রসর করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। নির্দেশনার জন্য নেতৃত্ব প্রয়োজন। নেতৃত্ব শ্রমিক-কর্মীদের মনোবলকে চাঙ্গা রেখে তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাকে বেগবান করে তোলে। একজন নেতার উদ্যোগ, তদারিক, অনুপ্রেরণা কর্মীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা জাগ্রত করে, কার্য সম্পাদনের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ কারণে একটি সংগঠনে নির্দেশনা ও নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে, যে কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনকে সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এর শ্রমিক-কর্মী তথা মানব সম্পদ। এ শ্রমিক-কর্মীদের যথাযথ মূল্যায়ন করা না হলে তাদের দ্বারা কখনো উত্তম কার্যফল আশা করা যায় না। এ কারণেই ব্যবস্থাপকগণ যেসব কাজ করে থাকেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কর্মীদের কাজে অনুপ্রাণিত করা। কর্মীদের প্রত্যাশা, চিন্তা-চেতনা, কাজের প্রকৃতি, কার্য পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন আর্থিক ও অনার্থিক সুবিধাদি প্রদান করতে হয়, যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হতে পারে। কর্মীদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা তথা প্রণোদনা দানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাজে উদ্বুদ্ধ করার এ প্রক্রিয়াকে প্রেষণা বলা হয়। প্রেষণার ফলে কর্মী তার সকল আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনে ব্রতী হয়। এ পাঠে আমরা নেতৃত্ব ও প্রেষণা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আলোচনা করবো।

নেতৃত্ব কী
What is leadership

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বোঝতে পেরেছি, নির্দেশনা এবং নের্তত্ব অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। নেতৃত্ব কী তা বোঝার আগে আমাদের জেনে নেয়া দরকার নির্দেশনা কাকে বলে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপক কর্তৃক অধস্তন কর্মীদেরকে যে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করা হয় তাকেই নির্দেশনা বলে। অর্থাৎ কোনো কাজ কখন, কোন পদ্ধতিতে সম্পাদন করতে হবে যে সম্পর্কে কর্মীদেরকে যে নির্দেশ জারি করা হয় তাই নির্দেশনা। নির্দেশনা শুধুমাত্র আদেশ জারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের সাথে জড়িত উপদেশ, পরামর্শ, ইচ্ছার প্রকাশ, অবহিতকরণ, প্ররোচনাদান, আদিষ্ট কাজের তদারকিকরণ ইত্যাদি সবই নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। নির্দেশনা সর্বদাই ওপর হতে নিচের দিকে আসে অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিই অধস্তনদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকে। এবার আসুন জেনে নিই নেতৃত্ব কাকে বলে।

নেতৃত্বের সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন এ কথা অনস্বীকার্য। একেকজন একেকভাবে নেতৃত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা পাওয়া দুষ্কর। এ কারণে একজন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ বলেছে: *যতজন নেতৃত্বের সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন অন্তত ততটি নেতৃত্বের সংজ্ঞা পাওয়া যাবে*। তবে, প্রায় সবাই একটি ব্যাপারে একমত যে, নেতৃত্বেও বিষয়টি প্রভাব-প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা থেকে ভিন্নতর কিছু কি-না, এ ব্যাপারে সমভেদ রয়েছে। মতদ্বৈততা থাকা সত্ত্বেও

আমরা নেতৃত্বের এটি ব্যাপক-অর্থ বিশিষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারি। আমরা সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে বলতে পারি যে, নেতৃত্ব হচ্ছে বিশেষ কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদেরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা কোনো দল বা গোষ্ঠীর কাজকে কিংবা তাদের আচরণকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে আসরা ক্ষমতাই নেতৃত্ব হিসেবে অভিহিত করা যায়। এটি কোনো ব্যক্তিবর্গ বা দলীয় সদস্যদের পরিচালনা করার একটি কৌশল যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিবর্গ বা দলীয় সদস্যদেরকে কাঙ্ক্ষিত আচরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। যে ব্যক্তি কোনো দল বা গোষ্ঠীকে তার মতের দিকে নিয়ে আসেন বা প্রভাবিত করেন তাকে নেতা বলা হয়ে থাকে। নিম্নে নেতৃত্ব সম্পর্কে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সংজ্ঞা উল্লিখিত হলো:

- **ভ্যান ফ্লিট** (Van Fleet) এর মতে, "নেতৃত্ব হলো একটি প্রভাব প্রক্রিয়া যা অন্যদের আচরণ পরিবর্তনে নিবেদিত হয়।" [Leadership is an influence process directed at shaping the behavior of others.]
- **কিথ ডেভিস** (Keith Davis) বলেন, "নেতৃত্ব হলো উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে অন্যান্য লোকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য করার একটি প্রক্রিয়া।" [Leadership is the process of encouraging and helping others to work enthusiastically toward objectives.]
- **আর. ডাব্লিউ. গ্রিফিন** (R.W.Griffin)-এর মতে, "অন্যকে প্ররোচিত বা প্রভাবিত করার ক্ষমতাকে নেতৃত্ব বলা যায়।" [Leadership can be defined as the ability to influence others.]

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় ব্যক্তি বা দলের কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াই হলো নেতৃত্ব। নেতৃত্বের সাধারণ ধারণা পাওয়া গেল। এবার আসুন আমরা নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটি মিল খুঁজে বের করি।

নেতৃত্ব বনাম ব্যবস্থাপনা

Leadership versus management

নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কতিপয় মিল রয়েছে, আবার কিছু অমিলও রয়েছে। নিচের চিত্রে লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, ব্যবস্থাপক না হয়েও কেউ নেতা হতে পারে; আবার কেউ নেতা না হয়েও ব্যবস্থাপক হতে পারে। বাস্তবে আমরা দেখি যে, সব নেতা ব্যবস্থাপক নন এবং সব ব্যবস্থাপকও নেতা নন (not all leaders are managers and not all managers are leaders)। প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর একজন ব্যবস্থাপক কতগুলো আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা পেয়ে থাকেন।

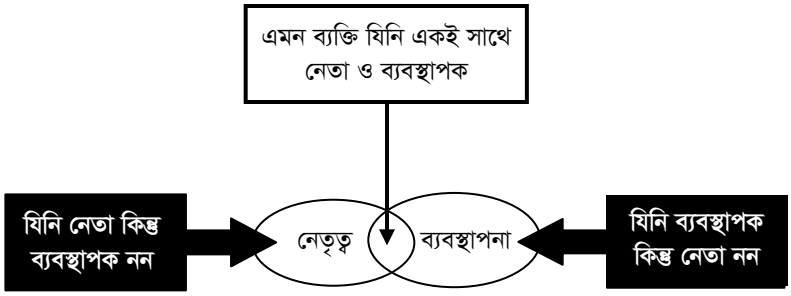

চিত্র ১২.৯: নেতৃত্ব বনাম ব্যবস্থাপনা

সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে একজন ব্যবস্থাপক তার অধীনস্থ কর্মীদেরকে পরিচালিত করতে পারেন, নির্দেশ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি শুধুই ব্যবস্থাপক, নেতা নন। কিন্তু তিনি যদি অধীনস্থদের সংগঠিত করে তাদেরকে বিভিন্ন কৌশলে কাজে উদ্যমী করে তুলতে পারেন, তখন তিনি তাদের নেতাও বটে।

নেতৃত্বের ধরন বা স্টাইল বা নেতৃত্বের প্রকারভেদ

Patterns or styles of leadership or types of leadership

নেতাকে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং এতে তাঁর আচারআচরণ, ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিও ভিন্ন হয়ে থাকে।

নিচে নেতৃত্বের প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো:

ক) আনুষ্ঠানিকতাভিত্তিক নেতৃত্ব

আনুষ্ঠানিকতার ভিত্তিতে নেতৃত্বকে দুভাগে ভাগ করা যায়-

১. **আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব (Formal leadership)**: এ নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিক কাঠামো থেকে সৃষ্টি এবং বৈধ ক্ষমতার বলে ঊর্ধ্বতন অধস্তনদের নেতা হিসেবে গণ্য হন। একটি কলেজের অধ্যক্ষ এ ধরনের নেতৃত্বের উদাহারণ। অনেকটা পদাধিকার বলে এ ধরনের নেতার জন্ম হয়।

২. **অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব (Informal leadership)**: আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের বাহিরেও যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকে অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের নেতার কোনো বিধিবদ্ধ ক্ষমতা থাকে না। তাদের ব্যক্তিত্ব দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করে।

খ) ক্ষমতাভিত্তিক নেতৃত্ব

নেতার ক্ষমতা প্রয়োগের ভিত্তিতে নেতৃত্বকে চার ভাগে ভাগ করা যায়-

১. **স্বৈরতান্ত্রিক বা স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্ব (Autocratic leadership):** নেতা যখন অনুসারীদের সাথে স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ করেন তখন তাকে স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্ব বলে। স্বেচ্ছাচারী নেতা ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রাখেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মীদের অংশ নেওয়ার সুযোগ দেন না বরং নিজের সিদ্ধান্ত তাদের ওপর চাপিয়ে দেন, নেতার ইচ্ছানুসারে কাজ না করা হলে কর্মীদের শাস্তির ভয় দেখান কিংবা চাকরিচ্যুত করেন। তবে এরূপ নেতৃত্বের প্রধান সুবিধা হলো- এতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

২. **অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব (Participative leadership):** যে ধরনের নেতৃত্বে কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বা অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব বলে। এরূপ নেতৃত্বের সুবিধা হলো কর্মীরা সন্তুষ্ট থাকে এবং কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়।

৩. **অবাধ বা লাগামহীন নেতৃত্ব (Free-rein leadership):** যে নেতৃত্বে নেতা বা ব্যবস্থাপক নিজের ক্ষমতা নিচের স্তরে বিন্যস্ত করে কর্মীদের স্ব-স্ব কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেন তাকে অবাধ নেতৃত্ব বলে। একে মুক্ত নেতৃত্বও বলে। এক্ষেত্রে নেতা ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিহার করে চলে, কর্মী দলকেই তাদের সমস্যা সামাল দেবার পরামর্শ দেয় এবং এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতা তেমন ভূমিকা গ্রহণ করেন না। কর্মীদলের যোগ্যতার ওপর অবাধ নেতৃত্বের সাফল্য নির্ভর করে। সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাবে এ ধরনের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে।

৪. **পিতৃসুলভ নেতৃত্ব (Paternalistic leadership):** এ ধরনের নেতৃত্বে যেখানে নেতা কর্মীদের সাথে পিতৃসুলভ আচরণ করেন। এক্ষেত্রে নেতা কর্মীদেরকে স্নেহের ডোরে আবদ্ধ করে। এ নেতৃত্ব কখনো সুফল বয়ে আনলেও কর্মীর সৃষ্টিশীলতায় এটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

গ) প্রেষণাভিত্তিক নেতৃত্ব

প্রেষণাভিত্তিক নেতৃত্ব দু ধরনের-

১. **ইতিবাচক নেতৃত্ব (Positive leadership):** যে ধরনের নেতৃত্বে নেতা কর্মীদেরকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎসাহিত করেন তাকে ইতিবাচত নেতৃত্ব বলা হয়। ভালো কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদানের ফলে কর্মীরা তাদের কার্যে অধিক মনোনিবেশ করে।

২. **নেতিবাচক নেতৃত্ব (Negative leadership):** এ জাতীয় নেতৃত্ব কর্মীদেরকে ভয়-ভীতি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কার্য আদায় করতে তৎপর হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অবহেলা বা কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ জাতীয় নেতৃত্বে কর্মীরা কর্ম সম্পাদনে অধিক সাবধানী হয়ে থাকে।

একজন আদর্শ নেতার গুণাবলি

Qualities of a good leader

স্থান, কাল, পাত্র ভেদে নেতৃত্বের গুণাবলি ও ধরন বদলায়। কোন্ কোন্ গুণের অধিকারী হলে একজন ব্যক্তিকে আদর্শ নেতা বলা হবে তা বলা কঠিন। তবে এমন কিছু গুণ রয়েছে যেগুলো আত্মস্থ করতে পারলে একজন নেতা উত্তম বা আদর্শ নেতায় পরিণত হতে পারেন। এ গুণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **মোহনীয় ব্যক্তিত্ব (Pleasing personality):** একজন নেতাকে অবশ্যই মোহনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। ব্যক্তিত্বই একজন নেতার প্রধানতম গুণ। ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে নেতা অন্যের ইচ্ছা শক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

২. **শক্তি ও সামর্থ্য (Power and ability):** একজন নেতার পর্যাপ্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি থাকা প্রয়োজন, যা তাঁকে উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে।

৩. **জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা (Sufficient knowledge and experience):** একজন নেতাকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয়।

৪. **সহযোগিতমূলক মনোভাব (Cooperative attitude):** একজন নেতাকে অধস্তনদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হয়। সুতরাং সহযোগিতামূলক মনোভাব নেতাকে কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে।

৫. **শিক্ষাগত যোগ্যতা (Educational qualification):** প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেতাকে নেতৃত্বে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। এ কারণে তাকে অন্তত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হয়।

৬. **ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা (Ability of taking risk):** প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একজন নেতাকে দায়দায়িত্ব নিয়ে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। তাই নেতাকে ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা আয়ত্ব করতে হবে।

৭. **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Taking quick decision):** প্রতিষ্ঠানে বিভিন্নমুখী প্রয়োজনে নেতাকে বিকল্প কর্মপন্থা উদ্ভাবনসহ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকা একান্ত অপরিহার্য।

৮. **সাংগঠনিক দক্ষতা (Organisational efficiency):** কর্মীদের সুসংগঠিত করে তাদেরকে লক্ষ্য অর্জনের পথে ধাবিত করার জন্য একজন নেতাকে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

৯. **সততা ও ন্যায়পরায়ণতা (Honesty and justice):** নেতাকে সব সময়ই তার অনুসারীরা অনুকরণ করে থাকে। সে জন্য নেতাকে হতে হয় সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। নেতাকে অধিনস্তদের প্রতি ন্যয় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

১০. **আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা (Ability of controlling emotion):** আবেগ ব্যক্তিত্বকে হালকা করে ফেলে। একজন নেতাকে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আবেগ নিয়ন্ত্রণ কতে হবে এবং ধীরস্থিরভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

১১. **যোগাযোগে দক্ষতা (Communication skill):** যোগাযোগ দক্ষতা নেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। নেতৃত্বে সফলতার জন্য নেতাকে তাঁর অনুসারীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

১২. **দূরদর্শিতা (Prudence):** পূর্বানুমান সঠিক হলে সুফল পাওয়া যায়। তাই একজন নেতাকে দূরদর্শী হতে হবে।

১৩. **বুদ্ধিমত্তা (Intelligence):** নেতাকে সর্বদাই নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়। এসব চ্যালেঞ্জকে তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলা করতে হলে তাঁকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়।

১৪. **সংশ্লিষ্ট কাজে পারদর্শিতা (Expertise in concerned work):** একজন নেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী না হলে প্রাসঙ্গিক সমস্যা সমাধান ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জ্ঞান ও ধারণা প্রদান করা তার দ্বারা সম্ভব হয় না।

১৫. **প্রখর স্মৃতিশক্তি (Strong memory):** উত্তম নেতৃত্ব প্রদান ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তাঁকে অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হয়।

১৬. **ধৈর্য্য (Patience):** বিরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য হারিয়ে ফেললে লক্ষ্য অর্জনের পথ থেকে বিচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকে। একারণে আদর্শ নেতাকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও স্থির চিত্তের অধিকারী হতে হয়।

প্রেষণা
Motivation

ব্যবস্থাপকেরা যেসব কাজ করে থাকেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কর্মীদেরকে প্রণোদিত বা পুরস্কৃত করা। প্রেষণা একটি জটিল কাজ। কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক থাকে; পোষণ করে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা আর কাজের প্রতি থাকে একেক ধরনের মনোভাব। কেউ কেউ জন্মগত ভাবেই নাখোশ প্রকৃতির, কেউ কেউ একটুতেই চটে যায়, কেউ কেউ চালবাজ বা খল প্রকৃতির, আবার কেউ কেউ একটুতেই পরিতৃপ্ত। তাই ব্যক্তির মানসিক গঠন, শিক্ষাগত ও সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক-ধর্মীয় মতধারা, কাজের ধরন ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে কর্মীদেরকে সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টা চালাতে হয়। একজন কর্মী যে-কারণে প্রেষিত হবে আরেকজন সে কারণে প্রেষিত নাও হতে পারে। একজন কর্মীর হয়তো বেতন বাড়ালেই তার প্রেষণা বৃদ্ধি পায়, আরেকজনকে হয়তো গায়ে হাত বুলিয়ে প্রশংসা করলেই সে অনেক বেশি প্রেষণা লাভ করে। এসব কারণেই ব্যবস্থাপকের জন্য প্রেষণার কাজটি খুবই জটিল। প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে প্রেষণার এ গুরুত্বের কারণে আমরা প্রেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এখানে আলোচনা করবো।

প্রেষণা বলতে কী বোঝায়
What is meant by motivation

প্রেষণা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধিকতর কর্মপ্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। মানুষ তার কর্ম প্রচেষ্টার জন্য স্বত:স্ফূর্তভাবে কোনো কাজে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত হলে এ প্রক্রিয়াটি প্রেষণা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। প্রেষণা মানুষের অন্তরে নিহিত একটি সুপ্ত শক্তি যা উজ্জীবিত হলে মানুষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করে। অনুপ্রেষিত (motivated) ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, স্বীয় উদ্যোগে, অধিকতর দক্ষতার সাথে তার কার্য সম্পাদনের স্বচেষ্ট হয়। অভাব বা প্রয়োজনবোধ থেকেই প্রেষণার উদ্ভব। মানুষের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ হলে সে প্রেষিত (বা অনুপ্রেষিত) হয়েছে বলা যায়। মানুষের এ প্রয়োজন এবং তা পূরণের সহজ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

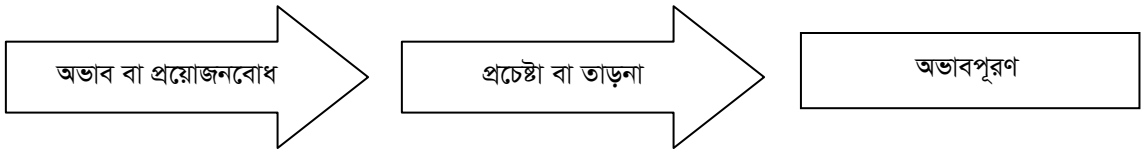

চিত্র ১২.১০: প্রেষণা প্রক্রিয়া

প্রেষণা কী তা জানা হলো। এবার আসুন, প্রেষণা সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবস্থপনা বিশারদের মতামত জেনে নিই।

১. **S. A. Sherlekar**- এর মতে, যে ব্যবস্থাপকীয় কার্যের সাহায্যে ব্যক্তিবর্গকে কার্য সম্পাদনে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিক ও তাড়িত করা যায় তাকে প্রেষণা বলে। [Motivation is a managerial function to inspire, encourage and impel people to take required action]

২. **H. Weihrich** এবং **H. Koontz**- এর মতে, সব ধরনের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং সমশক্তির জন্য যে সাধারণ ধারণা প্রয়োগ করা হয় তাকে প্রেষণা বলে। [Motivation is a general term applying to entire class of drives, desires, needs, wishes and similar forces]

৩. **Keith Daris** এবং **H.John W. Newstrom**- এর মতে, কাজের দিকে কর্মীকে ধাবিত করার শক্তিই হলো প্রেষণা। [Motivation is the strength of the drive towards an action]

৪. **Michael Jucious** বলেছেন প্রেষণা হচ্ছে, ব্যবস্থাপক কর্তৃক সে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ যা কর্মীদেরকে নির্ধারিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদক করতে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, প্রেষণা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থাকীয় প্রক্রিয়া যা কোনো কর্মীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কার্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে, ফলে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে সে তার সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করতে সচেষ্ট হয়। কর্মী যাতে তার সর্বোচ্চ পরিপক্কতা (maximum maturity) প্রয়োগ করতে পারে মূলত প্রেষণা সেই কাজটি করে থাকে।

প্রেষণার তত্ত্বসমূহ বা প্রেষণার মতবাদসমূহ

Theories of motivation

প্রেষণা সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক F. W. Taylor থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অনেক ব্যবস্থাপনাবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ কর্মীদের প্রেষণা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ বা তত্ত্ব প্রদান করেছেন। প্রেষণা সম্পর্কে যেসব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি তত্ত্বের নাম এবং উদ্ভাবকের নাম এখানে দেওয়া হলো:

	প্রেষণা তত্ত্ব	উদ্ভাবক
১.	চাহিদা সোপান তত্ত্ব	আব্রাহাম মাস্‌লো
২.	দ্বি-উপাদান তত্ত্ব	ফ্রেডারিক হার্জবার্গ
৩.	*X* এবং *Y* তত্ত্ব	ম্যাকগ্রেগর
৪.	প্রত্যাশা তত্ত্ব	ভিক্টর এইচ. ভ্রুম
৫.	ত্রয়ী চাহিদা তত্ত্ব	ম্যাকক্লিল্যান্ড
৬.	*E R G* তত্ত্ব	এলডারফার
৭.	সমতা তত্ত্ব	জে, স্টেসি এ্যাডাম্‌স

প্রেষণার ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় দুটি তত্ত্ব হচ্ছে চাহিদা সোপান তত্ত্ব এবং দ্বি-উপাদান তত্ত্ব। এখানে আমরা শুধুমাত্র এ দুটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

মাসলোর চাহিদা- সোপান তত্ত্ব

Maslow's need hierarchy theory

প্রেষণার বহুল আলোচিত তত্ত্ব হলো বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম মাসলোর চাহিদা-সোপান তত্ত্ব। ১৯৪৩ সালে তিনি এ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এ মতবাদটি মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব নামে পরিচিত। এ তত্ত্ব অনুসারে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পাঁচটি চাহিদার (বা অভাবের) একটি সোপান বিদ্যামান। এগুলোর মধ্যে প্রথম চাহিদা পূরণ হলে মানুষ দ্বিতীয় চাহিদা পূরণে তৎপর হয়। এভাবে ক্রমানুসারে চাহিদা পূরণ হতে থাকলে মানুষ চাহিদার শেষ স্তরে পৌঁছে। মাসলোর মতে, ব্যবস্থাপকদের কাজ হচ্ছে কোন কর্মীর চাহিদার কোন স্তরে আছে তা নিরূপণ করার পর সে স্তরের চাহিদাগুলো মেটানোর চেষ্টা করা। এ চাহিদাগুলো নিম্নরূপ:

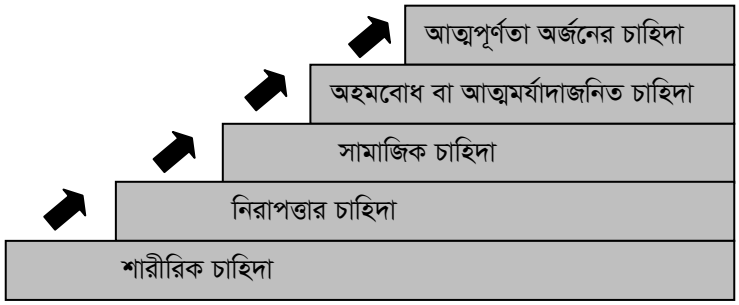

১. **শারীরিক চাহিদা (Physiological needs):** যেসব অভাব বা চাহিদা মানুষের শরীরগত তথা জীবন ধারণের জন্য একান্ত অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয় সেগুলো শারীরিক চাহিদা হিসেবে গণ্য। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাসস্থান এবং অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজন।

২. **নিরাপত্তার চাহিদা (Safety needs):** যেসব চাহিদা মানুষের দৈহিক, আর্থিক ও মানসিক নিরাপত্তার সাথে জড়িত সেগুলোকে নিরাপত্তার চাহিদা বলা হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে- শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা, যেমন- চাকুরির নিরাপত্তা, আয়ের নিরাপত্তা, শারীরিক তথা জীবনের নিরাপত্তা ইত্যাদি।

৩. **সামাজিক চাহিদা (Social needs):** মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। তাই সমাজের মানুষের সঙ্গে বাস করতে গিয়ে সে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পারস্পরিক স্নেহ, ভালোবাসা, মায়ামমতা, বন্ধুত্বের বন্ধন, অন্যের দ্বারা স্বীকৃতি ইত্যাদিই সামাজিক চাহিদা হিসেবে গণ্য হয়।

৪. **অহমবোধ বা আত্মমর্যাদাজনিত চাহিদা (Esteem need):** সামাজিক চাহিদা পূরণ হলে মানুষের মান-মর্যাদা বা অহমবোধজনিত চাহিদার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ মানুষ এক্ষেত্রে ক্ষমতা চায়, চায় উচ্চ মর্যাদা এবং অপরের প্রদত্ত সম্মান। এ চাহিদার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে- আত্মসম্মান, কাজের স্বাধীনতা, কৃতিত্ব অর্জন, পদমর্যাদা, অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ ইত্যাদি।

৫. **আত্মপূর্ণতা অর্জনের চাহিদা (Self-actualisation needs):** আত্মপূর্ণতা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা মানুষের সর্বোচ্চ স্তরের অভাব বা চাহিদা। এ পর্যায়ে মানুষ তার সৃজনশীলতা তথা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে চায়, সে নিজেকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে চায়। এ জাতীয় চাহিদার মধ্যে রয়েছে- শিল্প সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সমাজ সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ। এটি উচ্চশ্রেণির ব্যক্তির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। শ্রমিক শ্রেণি এটির কল্পনাও করতে পারে না।

মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব অনুসারে মানুষের চাহিদাগুলোর মধ্যে একটি পূরণ হলে আর একটি অভাব দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবে মানুষের অভাব অসীম। আবার একই সময়ে তার একাধিক অভাবও দেখা দিতে পারে। এ তত্ত্বের অনেক ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও এটি সবার কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব
Herzberg's two-factor theory

১৯৫৯ সালে হার্জবার্গ, মার্সলার ও সিনকার ম্যান আমেরিকার পিটার্সবার্গ শিল্প এলাকায় গবেষণা চালিয়ে হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব' উদ্ভাবন করেন। এ তত্ত্ব অনুযায়ী কর্মীদের কাজের প্রতি প্রেষণা দেওয়ার জন্য দু ধরনের উপাদান প্রয়োজন। যেমন:

১. প্রেষণামূলক উপাদান (Motivational factors)
২. হাইজিন উপাদান (Hygine factor)

১. প্রেষণামূলক উপাদান: এগুলো শ্রমিককর্মীদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। সাফল্য স্বীকৃতি, অগ্রগতি কাজটি স্বয়ং এবং উন্নয়ন সম্ভাবনা ইত্যাদি প্রণোদনাদানকারী উপাদান। হার্জবার্গ বলেছেন, আজকের ঐ সমস্ত প্রণোদনাদানকারী উপাদান সম্পর্কে। এবার আসুন, হাইজিন উপাদানগুলো জেনে নিই।

২. হাইজিন উপাদান: যে সকল উপাদান লোকজনের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির সাথে জড়িত তাগিদকে স্বাস্থ্য উপাদান বলে। হাইজিন উপাদানগুলো কর্মীদের প্রণোদিত করে না এবং এগুলোর অভাবে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। যেমন- কোম্পানি পলিসি ও প্রশাসন, কারিগরি তত্ত্বাবধান, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, বেতন, চাকরির নিরাপত্তা, কার্য পরিবেশ ও মর্যাদা ইত্যাদি।

কর্মীদের প্রেষণা দানের উপায় বা কৌশল

Ways or techniques of motivation

প্রেষণার উপাদান বা প্রেষণার উদ্দীপকসমূহ

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের চাকাকে সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। কর্মীদেরকে প্রেষণা দানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। এগুলোকে প্রেষণার উদ্দীপক বা উপাদানও বলা হয়। প্রতিষ্ঠান ভেদে এ উদ্দীপক ভিন্ন হতে পারে। মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্য, প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপরে ভিত্তি করে প্রেষণা দানের উপায় নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত কর্মীদের প্রেষণা দানের জন্য নিচের উপায়গুলো ব্যবহৃত হয়ে তাকে।

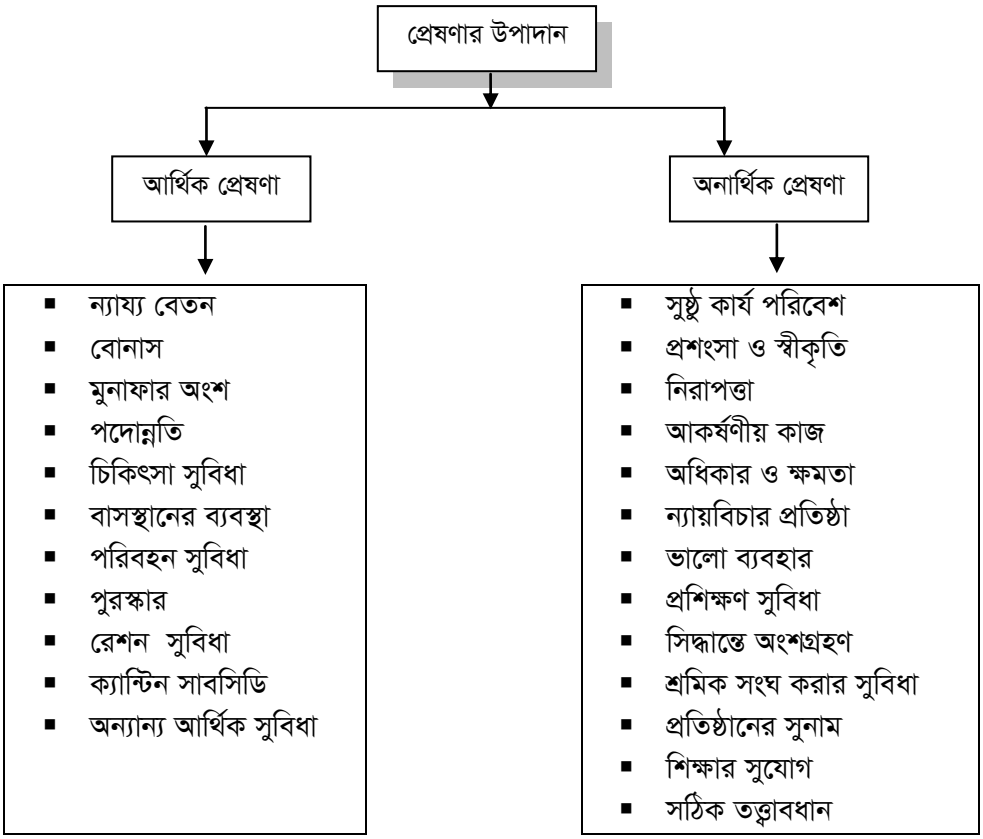

চিত্র ১২.১১: কর্মীদের প্রেষণাদানের উপায়

ক. আর্থিক প্রেষণা (Financial motivation) বা আর্থিক প্রেষণার উপাদান (Elements of financial motivation)

অর্থের বিনিময়ে যখন কর্মীদের প্রেষণা দেওয়া হয় তখন তা আর্থিক প্রেষণা হিসেবে গণ্য হয়। যেসব আর্থিক উপায়ে কর্মীদের প্রেষিত করা হয় সেগুলো নিম্নোক্ত আলোচনায় তুলে ধরা হলো:

১. **ন্যায্য বেতন (Fair salary):** কর্মীদের প্রথম ও প্রধান চাহিদা হচ্ছে তাদের কাজের বিনিময়ে উপযুক্ত বেতন বা পারিশ্রমিক। এ পারিশ্রমিকই তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের কর্মে একনিষ্ঠ হতে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মীদেরকে উপযুক্ত বেতন না দেওয়া হলে প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রতি তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

২. **বোনাস (Bonus):** উপযুক্ত বেতনের পাশাপাশি বোনাস প্রদান করেও কর্মীদেরকে প্রেষিত করা যায়। সাধারণত ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উৎসবে কর্মীদের জন্য বোনাসের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

৩. **মুনাফার অংশ প্রদান (Profit sharing):** প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রতি কর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য মুনাফার অংশ প্রদান করা যেতে পারে। মুনাফার অংশবিশেষ যদি কর্মীদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তাহলে তারা কাজের প্রতি উৎসাহিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকে।

৪. **পদোন্নতি (Promotion):** কর্মীদের প্রেষিত করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পদোন্নতি। দক্ষ ও যোগ্য কর্মীদের পদোন্নতি দানের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়।

৫. **চিকিৎসা সুবিধা (Medicare facilities):** শ্রমিক কর্মীদের সুচিকিৎসা প্রদান করা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কর্মীদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করার জন্য বিনামূল্যে কর্মীদের ও তাদের পরিবার পরিজনদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে তারা কাজে উৎসাহ খুঁজে পায়। অবশ্য এক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতাও দেওয়া যেতে পারে।

৬. **বাসস্থানের ব্যবস্থাকরণ (Accommodation facilities):** বাসস্থান সুবিধা মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। এ সুবিধা প্রদান করেও কর্মীদের প্রণোদিত করা যায়। তবে বাসস্থানের পরিবর্তে কর্মীদের বাসস্থান ভাতাও দেওয়া যেতে পারে।

৭. **পরিবহন সুবিধা (Transportation facilities):** অফিস কর্মীচারীদের যাতায়াত সমস্যা একটি বড় ধরনের সমস্যা। কাজেই এ সমস্যা সমাধানের জন্য যদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে কর্মীরা কাজে উৎসাহিত হয়।

৮. **পুরস্কার (Rewards):** কর্মীদের যদি ভালো কাজের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তাদের কাছ থেকে সৃষ্টিশীল কাজ আদায় করা সম্ভব। কেননা এতে তারা উক্ত কাজের স্বীকৃতি পায়।

৯. **রেশন সুবিধা (Ration facilities):** নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির হাত থেকে কর্মীদেরকে বাঁচানোর জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তে কমমূল্যে দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়। এতে কর্মীরা কাজে উদ্দীপ্ত হয়।

১০. **ক্যান্টিন সাবসিডি (Canteen subsidy):** প্রতিষ্ঠানে কার্যরত অবস্থায় শ্রমিক-কর্মীদের নাস্তা ও অন্যান্য খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে কর্মীরা স্বল্পমূল্যে ও সময়মত আহার গ্রহণ করতে পারে।

১১. **অন্যান্য আর্থিক সুবিধা (Other financial facilities):** উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়া প্রেষণা দানের আরও কয়েকটি উপাদান রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন ইত্যাদি। বর্তমানে বেতনের বিপরীতে কর্মীদেরকে ঋণ বা অগ্রিমও প্রদান করে থাকে।

খ. অনার্থিক প্রেষণা (Non-financial motivation) বা প্রেষণার অনার্থিক উপাদান (Non- financial elements of motivation)

আর্থিক উপাদান ছাড়া কর্মীদের প্রেষণা দানের জন্য অন্যান্য যেসব সুযোগ-সুবিধা দৌয়া হয় তা-ই অনার্থিক প্রেষণা। নিম্নে সে উপাদানগুলো উল্লেখিত হল ঃ

১. **সুষ্ঠু কার্য পরিবেশ (Fair working environment):** প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকা আবশ্যক। কারখানার অভ্যন্তরে খোলামেলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আলো-বাতাস চলাচলকারী ও কোলাহল মুক্ত পরিবেশে কর্মীরা কাজ করতে অধিক উৎসাহিত হয়।

২. **প্রশংসা ও স্বীকৃতি (Appreciation and recognition):** কৃত কর্মের প্রশংসা সব মানুষই কামনা করে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মীদের যদি ভালো কাজের জন্য প্রশংসা ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয় তাহলে তাদের নিকট থেকে উন্নতমানের কাজ আশা করা যায়।

৩. **নিরাপত্তা (Security):** চাকুরিক্ষেত্রে নিরাপত্তা না থাকলে কোনো কর্মী আন্তরিকতার সাথে কার্যে মনোনিবেশ করতে পারে না। ঠিক তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও নিরাপত্তা একান্ত অপরিহার্য। এগুলোর অভাব প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনে কর্মীদেরকে পরিপূর্ণভাবে একাত্ম হতে নিরুৎসাহিত করে।

৪. **আকর্ষণীয় কাজ (Fair salary):** কর্মীদের কাজ যদি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হয় তবে কর্মীরা উৎসাহের কাথে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

৫. **অধিকার ও ক্ষমতা (Rights and power):** কাজের ক্ষেত্রে যদি কর্মীদের অধিকার এবং পূর্ণ মাত্রায় ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রমিক কর্মীদেরকে অধিকার ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ দিতে হবে।

৬. **ন্যায়বিচার (Fair justice):** প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অনেক সময়ই নানারকম অভাব অভিযোগ থাকতে পারে। প্রতিষ্ঠান যদি এ ব্যাপারে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারে তবেই কর্মীরা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে।

৭. **ভালো ব্যবহার (Fair treatment):** অধস্তনদের নিকট তেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ আদায় করার আরেকটি উপায় হচ্ছে তাদের সাথে উত্তম বা সদয় আচরণ করা। এতে একদিকে যেমন অর্থ খরচ করতে হয় না তেমনি এর মাধ্যমে উর্ধ্বতন ও অধস্তনের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয় যা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক।

৮. **প্রশিক্ষণ সুবিধা (Training facilities):** প্রশিক্ষণ কর্মীদের মনোবল ও দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক। তাই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

৯. **সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ (Participation in decision):** ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্তে যদি কর্মীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে তাহলে কর্মীরা তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সদা তৎপর থাকে। তাই মাঝে মাঝে কর্মীদের সিদ্ধান্তে অয়ংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের উৎসাহিত করা যেতে পারে।

১০. **শ্রমিক-সংঘ করার সুযোগ দান (Granting union right):** বর্তমানকালে শ্রমিকসংঘ করার অধিকার কর্মীর একটি গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত। আর তাই কর্মীদেরকে শ্রমিকসংঘ গঠন করার সুযোগ দিয়ে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যায়।

১১. **প্রতিষ্ঠানের সুনাম (Goodwill of the organization):** প্রতিষ্ঠানের সুনাম কর্মীদের কাজে প্রেরণা যোগায়। অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে কর্মীরা গর্ববোধ করে।

১২. **শিক্ষার সুযোগ (Education facilities):** প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হলে কর্মীরা উৎসাহিত হবে।

১৩. **সঠিক তত্ত্বাবধান (Effective supervision):** সুষ্ঠু ও সঠিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে কর্মীকে যথাযথ মূল্যায়ন করে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। সঠিক তত্ত্বাবধানই কর্মীদের কাজে অনুপ্রাণিত করে এবং এতে কর্মীরা আগ্রহ ভরে কাজ করার সুযোগ পায়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, কর্মীদের প্রেষণা দানের ক্ষেত্রে আর্থিক ও অনার্থিক উভয় উপাদানই সমান গুরুত্ব বহন করে। কেননা, অর্থ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন হলেও উপরিউক্ত অনার্থিক উপাদানগুলোও মানব হৃদয়ে প্রশান্তি আনে, জীবনকে করে পরিতৃপ্ত।

সারসংক্ষেপ

বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় ব্যক্তি বা দলের কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াই হলো নেতৃত্ব। নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কতিপয় মিল রয়েছে, আবার কিছু অমিলও রয়েছে। ব্যবস্থাপক না হয়েও কেউ নেতা হতে পারে; আবার কেউ নেতা না হয়েও ব্যবস্থাপক হতে পারে। নেতাকে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং এতে তাঁর আচার-আচরণ, ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিও ভিন্ন হয়ে থাকে। আবার, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে নেতৃত্বের গুণাবলী ও ধরন বদলায়। কোন্ কোন্ গুণের অধিকারী হলে একজন ব্যক্তিকে আদর্শ নেতা বলা হবে তা বলা কঠিন। তবে এমন কিছু গুণ রয়েছে যেগুলো আত্মস্থ করতে পারলে একজন নেতা উত্তম বা আদর্শ নেতায় পরিণত হতে পারেন। প্রেষনা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধিকতর কর্মপ্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। মানুষ তার কর্ম প্রচেষ্টার জন্য স্বত:স্ফূর্তভাবে কোনো কাজে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত হলে এ প্রক্রিয়াটি প্রেষণা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। প্রেষণা সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক F. W. Taylor থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অনেক ব্যবস্থাপনাবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ কর্মীদের প্রেষণা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ বা তত্ত্ব প্রদান করেছেন। কর্মীদেরকে প্রেষণা দানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। এগুলোকে প্রেষণার উদ্দীপক বা উপাদানও বলা হয়। প্রতিষ্ঠান ভেদে এ উদ্দীপক ভিন্ন হতে পারে। মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্য, প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপরে ভিত্তি করে প্রেষণা দানের উপায় নির্ধারণ করা হয়।

পাঠ ১২.৫ নিয়ন্ত্রণ
Controlling

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- নিয়ন্ত্রণ কী বলতে পারবেন।
- নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশলগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

জীবনের প্রতিটি কার্যেই নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। আমরা যে সবসময়ই লিখিতভাবে নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পন্ন করি তা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সামাজিক জীবনে কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায় ক্ষেত্রে অলিখিতভাবেই নিয়ন্ত্রণ-কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেখানে পরিকল্পনা মাফিক কোনো কর্ম সম্পাদন করার প্রচেষ্টা চালানো হয় সেখানে "নিয়ন্ত্রণ" থাকা আবশ্যক। নতুবা পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। এমনকি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে কিনা তাও জানা সম্ভব হয় না। তাই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও বাস্তবায়নকালে অনাকাঙ্খিত সমস্যা বা ত্রুটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য নিয়ন্ত্রণ কার্য চালু রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যবস্থাপকেরই এজন্য ব্যবসায়িক জগতে নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান রাখা দরকার। এ পাঠে আমরা ব্যবস্থাপকের প্রয়োজনকে সামনে রেখে নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করবো।

নিয়ন্ত্রণ
Controlling

ব্যবস্থাপনার চারটি প্রধান কার্যাবলির শেষ কার্য হলো নিয়ন্ত্রণ। প্রাতিষ্ঠানিক জগতে নিয়ন্ত্রণ বলতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কর্মস্পাদনের পরিমাপণ ও ত্রুটি সংশোধনকরণকে বোঝানো হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা কিংবা নির্ধারিত মান অনুসারে কাজকর্ম চলছে কিনা তা দেখাই নিয়ন্ত্রণের কাজ। কার্যক্ষেত্রে কোন রকম ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়লে তার কারণ চিহ্নিত করার পর যথাযথ সংশোধনী এনে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় তা দূর করা হয়। সে কারণে নিয়ন্ত্রণকে নিরাময়মূলক ব্যবস্থাও বলা হয়। পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। পরিকল্পনা না থাকলে নিয়ন্ত্রণ মূল্যহীন। কেননা পূর্ব পরিকল্পনা বা নির্ধারিত মান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম নিচে দেখানো হলো:

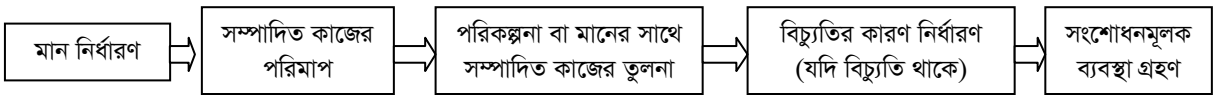

চিত্র ১২.১২: নিয়ন্ত্রণের প্রবাহ চিত্র

এবার আসুন, নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যবস্থাপনা বিশারদের কথা জেনে নেই-

- **H. Weihrich** ও **H. Koontz** -এর মতে "পরিকল্পনা অনুযায়ী যাতে কার্য সম্পাদিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সম্পাদিত ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজ পরিমাপ ও সংশোধন করাকেই নিয়ন্ত্রণ বলে।" [Controlling is measuring and correcting individual and organisational performance to ensure that events conform to plans][1]

[1] Weirich, Heinz & Koontz, Harold, *Management: A &lobal perspective*, 10th Int. edition, Mc Graw Hill Inc. Page-21.

- **Henry Fayol** -এর বক্তব্য মতে, "নিয়ন্ত্রণ হলো গৃহীত পরিকল্পনা, জারিকৃত নির্দেশনা ও প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী কার্য পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা।" [Control involves whether anything occurs in conformity of the plan, the instructions issued and principles established][2]
- **অধ্যাপক দূর্গাদাস ভট্টাচার্য্য**-এর ভাষায়, "পরিকল্পনা অনুসারে কার্য সম্পাদন হচ্ছে কি-না তা নিরীক্ষণ করা, প্রকৃত কার্য ও বিনির্দিষ্ট কার্যের মধ্যে বিচ্যুতি নিরূপণ করা এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বলে।"[৩]

পরিশেষে বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা বা পূর্ব নির্ধারিত মান অনুযায়ী কার্যাবলি সম্পাদিত হচ্ছে কি-না তা যাচাই করা এবং কোনরূপ বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তার কারণ নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বলে। একটি প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল হলে তা চলমান রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। নিয়ন্ত্রণ কী তা জানা হলো– এবার আসুন নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেগুলো বা এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ বা প্রক্রিয়া

Steps or process of controlling

নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কতকগুলো ধারাবাহিক পদক্ষেপের সমষ্টি। এ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবস্থাপকগণ বিশারদ ভিন্ন ভিন্ন মতামত দিয়েছেন। যেমন– W.H. Newman নিয়ন্ত্রণের ৩টি ধাপ, যথা- মান নির্ধারণ, কার্যফল পরীক্ষা ও রিপোর্ট প্রণয়ন এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থার কথা বলেছেন। নিউপোর্ট ও ট্রি ওয়াথা ৫টি কার্য যথা- মান নির্ধারণ, কার্য পরিমাপ, মানের সাথে কার্যফলের তুলনাকরণ, এ দুয়ের পার্থক্য পরিমাপ এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন। এগুলো বিবেচনা করে আমরা নিয়ন্ত্রণের নিম্নোক্ত পাঁচটি পদক্ষেপ আলোচনা করবো:

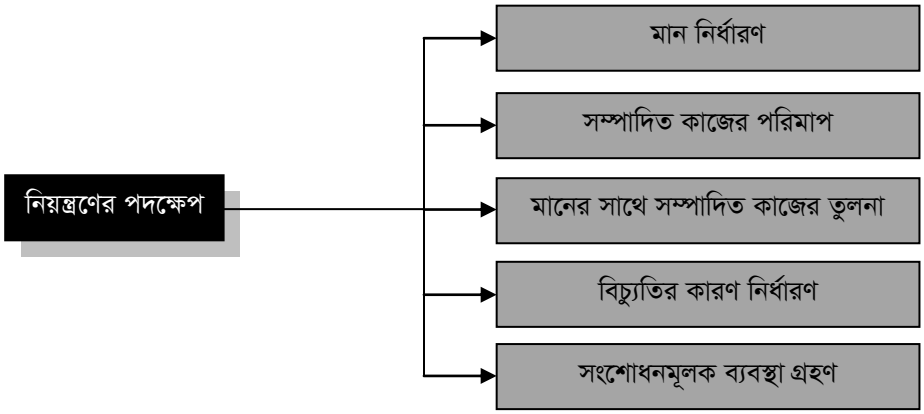

১. **মান নির্ধারণ (Setting of standard):** নিয়ন্ত্রণ কার্যের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে আদর্শ মান প্রতিষ্ঠা। এ মান হচ্ছে পরিকল্পনার কতকগুলো নির্ধারিত বিন্দু যার দ্বারা ব্যবস্থাপক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। প্রত্যেকটি মান সুনির্দিষ্ট হয় এবং এর সময় বেঁধে দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য কী হবে তার ওপর ভিত্তি করেই মান নির্ধারণ করা হয়।

২. **সম্পাদিত কাজের পরিমাপ (Measuring performance):** এ পর্যায়ে যে মান নির্ধারিত হয়েছিল তার বিপরীতে প্রকৃত কার্যফল মাপা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পরিকল্পনা মোতাবেক কতটুকু কার্য সম্পাদিত হয়েছে তা নিরূপণ করা হয়। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, মৌলিক প্রতবিেদন ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজের অগ্রগতি বা ফলাফল পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

[2] Fayol, Henry, General & Industrial Management, Sir Isaac Pitman & Sons, London, 1949, Page-107.
[3] ভট্টাচার্য্য, দূর্গাদাস, কারবারের ব্যবস্থাপনা, পঞ্চম সংস্করণ, গ্লোব লাইব্রেরি, পৃষ্ঠা-৩৪৯।

৩. **মানের সাথে সম্পাদিত কাজের তুলনা (Comparing performance against standard):** নিয়ন্ত্রণের এ পদক্ষেপে নির্ধারিত মানের সাথে প্রকৃত কার্যফলের তুলনা করা হয়। আদর্শ মান বা প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে সম্পাদিত কার্যফলের তুলনা করে কোন রকম বিচ্যুতি থাকলে তাও নিরূপণ করা হয়। তবে যে সকল মান সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় না তা তুলনা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন- গ্রাহকদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি। এরূপ মান মূল্যায়ন করা যথেষ্ট দুরূহ কাজ।

৪. **বিচ্যুতির কারণ নির্ধারণ (Determining the causes of deviation):** আদর্শ মানের সাথে সম্পাদিত কার্যফলের কোনো বিচ্যুতি বা পার্থক্য দেখা গেলে এ পর্যায়ে সঠিকভাবে তা নিরূপণ করা হয় এবং তা যথাযথ বিশ্লেষণ করে বিচ্যুতির কারণ নির্ধারণ করা হয়। পরে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এ কারণ নির্ধারণ অত্যন্ত অপরিহার্য বিষয়।

৫. **সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ (Taking corrective actions):** নিয়ন্ত্রণের সর্বশেষ পদক্ষেপ হচ্ছে বিচ্যুতি বা ভুলত্রুটি শোধরানো। বিচ্যুতি নির্ধারণ ও তার সঠিক কারণ নিরূপণের পর এ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ, অধস্তনদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, কর্মী বরখাস্তকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। কাঁচামালের সরবরাহে কোন দুর্বলতা আছে কিনা, উৎপাদনে গাফিলতি রয়েছে কি-না ইত্যাদি বিষয়গুলো চিহ্নিত করেও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পেরে। এ সংশোধনমূলক পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি

Different techniques or methods of controlling

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বর্তমানে যে সব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা নিচে আলোচনা হলো:

১. **বাজেট (Budget):** বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল হচ্ছে বাজেটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ। পরিকল্পনাকে যখন সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বাজেট বলা হয়। এ পদ্ধতিতে বাজেটের মাধ্যমে মান নির্ধারণ করা হয় এবং পরে তার সাথে অর্জিত ফলাফল তুলনা করা হয়। কোনো বিচ্যুতি বা পার্থক্য থাকলে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সংখ্যায় প্রকাশ যোগ্য বিধায় এটি খুব জনপ্রিয়।

২. **পরিসংখ্যানিক উপাত্ত (Statistical data):** সংখ্যাভিত্তিক তথ্য পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ করে নিয়ন্ত্রণ কাজ করা যায়। যেমন- বিক্রয় কিংবা ব্যয় শতকরা কতভাগ বৃদ্ধি পেল বা হ্রাস পেল তা পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে বের করা যায়। কালীন সারণি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্যের তুলনা করে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. **বিশেষ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ (Special report analysis):** কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবেদন (**report**) সহায়তা করে থাকে। কোন কাজের ওপর নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রণয়নের ব্যবস্থা থাকলে তার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাহী সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কার্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

৪. **কার্য নিরীক্ষা (Operational audit):** নিয়ন্ত্রণের আর একটি কৌশল হচ্ছে কার্য নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা, যা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে ও নিয়মিতভাবে কাজের মূল্যায়ন করে থাকে। এ কাজটি কোনো কর্মচারী বা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক (**auditor**) সম্পাদন করে থাকে। ব্যবসায়ের হিসাব, অর্থ সংস্থান ইত্যাদি এরূপ নিরীক্ষা অনুসরণ করা হয়। তবে অন্যান্য কাজেও এটি প্রয়োগ করা যায়।

৫. **ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ (Personal observation):** ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের দ্বারাও প্রতিষ্ঠানের কার্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীরা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অধস্তনদের কাজের ভুলত্রুটি নির্ণয় করেন। এ পদ্ধতিতে পরে তিনি পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে সংশোধনমূলক কার্য সম্পাদন করেন।

৬. **তথ্য প্রযুক্তি (Information technology):** নিয়ন্ত্রণের একটি আধুনিক কৌশল বা উপায় হলো তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সুষ্ঠু তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। এ কারণে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে।

৭. **গ্যান্ট চার্ট (Gantt chart):** Henry L. Gantt নামক একজন ব্যবস্থাপনা বিশারদ সময় ও ঘটনা নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণের যে চার্ট তৈরি করেন তা-ই গ্যান্ট চার্ট। এটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সময়ে সঠিক কার্য সম্পাদনের নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। এ কারণে কার্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

৮. **পার্ট (PERT- Programme Evaluation and Review Technique):** এটি হলো একটি কার্যপ্রণালি মূল্যায়ন কৌশল। এ কৌশলের দ্বারা কাজের বিভিন্ন অংশের সময় ও ব্যয়ের সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন করা হয়। ফলে এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্য সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৯. **সমচ্ছেদ বিন্দু বা ব্রেক ইভেন বিশ্লেষণ (Break even point analysis):** এটি একটি রেখাচিত্র পদ্ধতি। এর মাধ্যমে আয় ও ব্যয়ের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। সমচ্ছেদ বিন্দু হচ্ছে সেই বিন্দু যেখানে আয় ও ব্যয় সমান হয়। একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

১০. প্রোগ্রাম বাজেটিং (**Programme budgeting):** বৃহৎ উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল। এ ধরনের বাজেট দ্বারা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। এতে মুনাফার সাথে ব্যয়ের বিষয়টি সঠিক আছে কি-না তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

উল্লিখিত কৌশলগুলো ছাড়াও তথ্য বিশ্লেষণ, কম্পিউটারের ব্যবহার, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিরস্কার ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত স্থাপন, স্থায়ী নিয়ম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ

প্রাতিষ্ঠানিক জগতে নিয়ন্ত্রণ বলতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কর্মস্পাদনের পরিমাপণ ও ত্রুটি সংশোধনকরণকে বোঝানো হয়। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কতকগুলো ধারাবাহিক পদক্ষেপের সমষ্টি। বিভিন্ন মনীষীর মতামত বিবেচনা করে নিয়ন্ত্রণের পাঁচটি পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়- মান নির্ধারণ, সম্পাদিত কাজের পরিমাপ, মানের সাথে সম্পাদিত কাজের তুলনা, বিচ্যুতির কারণ নির্ধারণ এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। এ পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩. ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি আলোচনা করুন।
৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৫. ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ছাত্র হিসেবে ব্যবস্থাপনা বিষয় পাঠের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৬. ব্যবস্থাপনা চক্র কী? চিত্রসহ আলোচনা করুন।
৭. ব্যবস্থাপক কে? বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপক সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৮. একজন ব্যবস্থাপকের কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন?
৯. পরিকল্পনা কী? পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করুন।
১০. আপনি কি মনে করেন পরিকল্পনা না থাকলে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলি অর্থহীন? এরূপ মনে করার পেছনে আপনার যুক্তি কী?
১১. পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১২. বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১৩. ব্যবস্থাপনা সংগঠন বলতে কী বোঝায়? সংগঠন প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ আলোচনা করুন।
১৪. সংগঠন কাঠামো এবং সংগঠন চার্ট কী? এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে? আলোচনা করুন।
১৫. বিভিন্ন প্রকার সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১৬. নেতৃত্ব কী? একজন নেতার কী কী গুণ থাকা দরকার সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
১৭. নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১৮. নেতৃত্ব ও ব্যবস্থপনার তুলনামূলক আলোচনা করুন।
১৯. প্রেষণা বলতে কী বোঝায়? প্রেষণা সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন তত্ত্বগুলো আলোচনা করুন।
২০. কর্মীদের প্রেষণাদানের কৌশলগুলো কী? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২১. নিয়ন্ত্রণ কী? নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াটি আলোচনা করুন।
২২. নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশলগুলো আলোচনা করুন।